গবেষণা প্রবন্ধ

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বহুমুখী ষড়যন্ত্র মুসলিম উম্মাহর করণীয়

মুফতী তাফাজ্জুল হুসাইন গাজীপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজনৈতিক অঙ্গনে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের কালো থাবা

ভিনদেশী যে কোন সংস্থা বা সংগঠনের মূল কাজ হল, বিদেশী অনুদান নিয়ে মাঠ পর্যায়ে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার অধিকার আদায়ে কাজ করা এবং কুশল বিনিময় করে প্রয়োজন অনুযায়ী গরীব-দুঃখীদের শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, জনসেবা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। রাজনৈতিক কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া তাদের কাজ নয়। অথচ এ দেশের খ্রিস্টান এনজিওগুলো শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। বর্তমানে দেশের সাধারণ নির্বাচনে এনজিওগুলো নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রার্থীকে বেআইনীভাবে প্রচুর অর্থ প্রদান করে থাকে এবং নিজেদের কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ের পূর্ণ ব্যবস্থা করে থাকে। বিভিন্ন সময় দেখা গেছে অনেক এনজিও প্রার্থী বড় তিন দলের টিকেটে জাতীয় সংসদের সদস্যও হয়েছে। এছাড়াও বিদেশী এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে শতকরা ৪৪ ভাগ গ্রামে নিজেদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। গত উপজেলা নির্বাচনে প্রথমবারের মতো তারা প্রকাশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। উপজেলা নির্বাচনে তারা ৪০০ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। তার মধ্যে ১০ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিতও হয়েছে। এছাড়াও এনজিও নিয়ন্ত্রিত ভূমিহীন সমিতির অনেক মহিলা উক্ত নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক প্রত্যেক ইস্যুতেও তারা নগ্ন হস্তক্ষেপ করে থাকে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ হেফাজতে ইসলামের ৫ মে'র ঘটনা।

হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফার বিরুদ্ধে এই কুচক্রী মহলই ইন্ধন যুগিয়েছে। তারাই হেফাজতের বিরুদ্ধে গার্মেন্ট সেক্টরসহ বিভিন্ন পেশার কর্মজীবী নারীদের গণজোয়ার (!) দেখাতে নারী সমাবেশ, সেমিনার, বক্তৃতা-বিবৃতির আয়োজন করেছে। কেবল তারাই নয়, তাদের গডফাদাররাও হেফাজতে ইসলামের ৪নং ও ৫নং দাবির বিরোধিতা করে আন্তর্জাতিকভাবে বিবৃতি দিয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে, মুসলিম জাগরণ বন্ধে কাফের-বেঈমানেরা সকলেই একাট্টা। তারা আমাদের মা-বোনদের সুশিক্ষা ও নিরাপদ কর্মস্থল চায় না। কারণ অধিকার সচেতন সুশিক্ষিত নারীকে তো আর নামমাত্র বেতনে গাধার খাটুনি খাটানো যাবে না, হাজার টাকার শ্রম মাত্র দু'শো টাকায় কেনা যাবে না এবং নারীশ্রমিকের নিরাপত্তা, চিকিৎসা, ইত্যাদি খাতে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ও যাবে বেড়ে। ফলে এসব সুদী মহাজনের মুনাফার পাহাড়ে ও বিলাসী জীবনে ধ্বস নামবে। কাজেই হেফাজতের ৪ ও ৫ নং ধারা তারা কিছুতেই বাস্তবায়ন করতে দিবে না।

ইয়াহুদীরা নিজেদের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এবং আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র মাধ্যমে সকল মুসলিম রাষ্ট্রে নিজেদের তাবেদার সরকার বানানোর নীলনকশা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রয়োজনে অর্থ, পদ, বাড়ি, গাড়ি, নারীসহ সবকিছু ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্য থেকে উমিচাঁদ আর মীর জাফর তৈরি করে নিচ্ছে। এটুকুই নয়, কোন মুসলিম দেশে ইসলামী দল ক্ষমতায় গেলে সাথে সাথে সেনাপ্রধানকে ক্রয় করে তাদেরকে দিয়ে সে সরকারকে উৎখাত করে দিচ্ছে।

এছাড়াও মুসলিম রাষ্ট্রের ইসলামী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ লাগিয়ে রাখা, চরম বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে জাতীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নিযুক্ত করা এবং এ ইস্যুতে হকপন্থীদের আন্দোলনে নামানো, উসামা বিন লাদেনকে সাইনবোর্ড বানিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের ভূমি ও খনিজ সম্পদ দখল করা, নিজেরা হামলা করলে অপরাধ দমন আর মুসলমান জবাব দিলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সাব্যস্ত করা– ইত্যাকার সকল কর্মকাণ্ডই মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র যা থেকে কোন মুসলিম জনপদ আজ মুক্ত নয়।

কুরআন-হাদীসের সহীহ তা'লীম তথা কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মুসলমানদের জন্য সেই মেরুদণ্ড হল, কুরআন-হাদীসের শিক্ষা। অথচ আজ বাংলাদেশে নব্বই ভাগ মুসলমান থাকার পরও দেশের সাধারণ শিক্ষায় কুরআন-হাদীস বাধ্যতামূলক নয়। ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পরামর্শে শিক্ষা-নীতিমালার নামে নৈতিকতা বিবর্জিত ধর্মহীন শিক্ষাসিলেবাস জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সত্যিকারার্থে এর মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ডটিই ভেঙে দেয়া হয়েছে। এমনিতেই গোটা বিশ্বজুড়ে সত্যপন্থীদের ওপর দমন-পীড়ন, নির্যাতন-নিপীড়ন, চলছে। কুরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক ও তাদের অনুসারীরা সর্বত্রই তাগুতের সামনে অসহায়। একই সূত্রে কওমী মাদরাসা ও তৎসংশ্লিষ্ট মহলও সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত ও তোপের মুখে নির্বাক। তারপরও ইয়াহুদী লবির মিডিয়াগুলোতে প্রতিনিয়ত এদের বিরুদ্ধে তথ্য-সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। কখনও বলা হচ্ছে- মাদরাসাগুলো সমাজে বেকার সৃষ্টি করছে; কখনও বলা হচ্ছে– মাদরাসাগুলো জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র; আবার কখনও চেঁচানো হচ্ছে- কওমী শিক্ষাধারাকে একমুখী শিক্ষার (ধর্মহীনতার) আওতায় আনা হোক। কারণ এই সিলেবাসে কূপমণ্ডুকতা চর্চা হয়; এর দ্বারা সমাজের ভালো কিছু হয় না। ইত্যাদি,ইত্যাদি। বলতে ইচ্ছে হয়, ওদের ধারণা অনুযায়ী ভালো কিছু না হলেও কওমী তালাবাদের দ্বারা কোন রকম খুন-খারাবী, ধর্ষণসেঞ্চুরী, টেন্ডার ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি কোনদিনই সম্ভব নয়। এসব তো ওদের মানস পুত্রদেরই সাজে এবং তারা করেও থাকে।

আসল কথা হল, ওরা ভাল করেই জানে যে, কওমী মাদরাসা হচ্ছে এই উম্মাহর জীবনীশক্তি-পাওয়ার হাউজ। তৎকালীন পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন কওমী তালাবাদের হাতে টুকরো টুকরো হওয়ায় এবং ইতোপূর্বে ব্রিটিশ রাজশক্তি এদের দেখানো পথে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত হওয়ায় বর্তমান পরাশক্তি বুঝে নিয়েছে, আখেরাত প্রত্যাশী, দেশপ্রেমিক এ সরল-সহজ মোল্লাগুলোর অস্তিত্ব যতদিন পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে বিদ্যমান থাকবে– কিছুতেই সে ভূখণ্ড নিরাপদে দখল করা সম্ভব হবে না। শেষ জীবনীশক্তিটুকু অবশিষ্ট থাকতেও এরা তা হতে দিবে

না। সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্যের কওমী বিরোধিতার এই হল মূল রহস্য। বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলোর বিরোধিতায় আজ তারা আদা-জল খেয়ে নেমেছে। অথচ ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হয়েও সেখানে প্রায় আট দশ হাজার কওমী মাদরাসা রয়েছে। হিন্দুস্তান সরকার তার কোনটাতেই হস্তক্ষেপ করে না। আর বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে চার হাজার কওমী মাদরাসা রয়েছে। এ নিয়েই তাদের যত মাথা ব্যথা।

কিন্তু তাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, পৃথিবীর ইতিহাসে কওমী শিক্ষা ধারাটিই সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা। বিগত দেড়শত বৎসরের পোড় খাওয়া কওমী মাদরাসা হাজার বছরের মুসাফির। সত্যের পথে সংগ্রামী এ কাফেলার আছে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা। এই শিক্ষা ধারা যেমন হিজায, মিশর, দামেশক, বাগদাদ, সমরকন্দ, বুখারা ও স্পেনের ইসলামী সভ্যতা ও শিক্ষার উত্থান দেখেছে, তেমনি সয়েছে তাতারী সয়লাব, ক্রুসেডের অপঘাত আর ইংরেজ লাল কুকুরের বিষাক্ত দংশন। কাজেই যুগের তাতারী আর ক্রুসেডররা হুশিয়ার! (সূত্র : ৩০ সালা স্মারক গ্রন্থ; মালিবাগ)

ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র কওমী মাদরাসার অভ্যন্তরেও চলছে পুরোদমে। বর্তমানে তারা মাদরাসা নামক কিছু প্রতিষ্ঠান বানিয়ে স্টাফদের বেতন-ভাতা,ছাত্রদের খোরাকি ও কিতাবপত্রসহ যাবতীয় খরচের যোগান দিচ্ছে। এদেরকে দিয়ে ভিতরে ভিতরে সারা দেশে খ্রিস্টবাদের তা'লীম ছড়িয়ে দিচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারদের আরেকটি কৌশল হল, সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রবেশের সুযোগ করে নেয়া। এ লক্ষ্যে তারা টাকা-পয়সা ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে নতুন নতুন গুপ্ত সংগঠন ও দল তৈরি করে। এসব সংগঠন মুসলমানের ছদ্মাবরণে ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে এবং মুসলিম জনপদে নিজেরাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের দলীল উপস্থাপন করে। সন্ত্রাসীদেরকে আলেম-উলামার বেশ ধরিয়ে জিহাদের নামে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। তারপর নিজেদের বানানো জিহাদিদের শায়েস্তা করার নামে কাঙ্ক্ষিত দেশটাকে দখল করে নেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের দেশের জেএমবির কর্মকাণ্ড ও সাম্প্রতিক সময়ে তালিবানের নামে পাকিস্তানের সেনাস্কুলে হামলা চালিয়ে শতাধিক শিশুহত্যা এ ধরণেরই একটা অপকৌশল। কারণ, ইসলামের সঙ্গে যার দূরতম সম্পর্কও রয়েছে তার দ্বারা এ পাপযজ্ঞ কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং চোখকান খোলা রেখে সময় থাকতেই আমাদের সাবধান হতে হবে।

মিডিয়া ও তথ্য সন্ত্রাসের কবলে মুসলমান

ইয়াহুদীরা পৃথিবীর সবচেয়ে ধূর্ত ও অভিশপ্ত জাতি। তাদের এই ন্যক্কারজনক অবস্থার মূল ভিত্তি হল, তাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস। বর্তমান ইয়াহুদীরা তাদের মূল আসমানী কিতাব তাওরাতের স্থলে অন্য একটি কিতাবকে আসমানী কিতাব মনে করে এবং এটাকে তাওরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে এই কিতাবের উপর আমল করে। যার নাম হল তালমুদ। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই কিতাবের সংকলনকারী হলেন হযরত উযাইর আ.। তাদের বক্তব্য হল, এই কিতাবে দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই বর্ণিত আছে। তারা আরো বিশ্বাস করে, যে ব্যক্তি উক্ত কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে তাৎক্ষণিক আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তাওরাতের ন্যায় তাদের এই কিতাবটিও অবিকৃত নেই এবং তার পূর্ণ অংশও তাদের নিকট সংরক্ষিত নেই। তালমুদের বর্তমান কপিগুলোতে কিছু জঘন্য আকীদা-বিশ্বাসের কথা পাওয়া যায়। যথা-

১. ইয়াহুদীরা আল্লাহ তা'আলার কাছে সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষা প্রিয়। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।

২. যদি দুনিয়াতে ইয়াহুদীদের অস্তিত্ব না হত তবে সূর্যের উদয় হত না এবং পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ হত না।

৩. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অধিকার দিয়েছেন।

৪. অ-ইয়াহুদীদের ধন-সম্পদ পরিত্যক্ত সম্পদের ন্যায়। ইয়াহুদীরা যেভাবে ইচ্ছা তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারে।

৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত সম্প্রদায় ইয়াহুদীদের অধীনে সকল প্রাণী ও মানুষকে (পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানকে) অর্পণ করেছেন। কারণ আল্লাহ জানেন যে, ইয়াহুদীদের এই উভয় প্রকার জানোয়ারের প্রয়োজন হবে।

৬. ইয়াহুদীদের জন্য অ-ইয়াহুদীদের ধন-সম্পদ হস্তগত করা ফরয, তা যেভাবেই হোক না কেন। যাতে দুনিয়ার সকল সম্পদ কেবল ইয়াহুদীদের মালিকনায় এসে যায়।

৭. ইয়াহুদীর জন্য উপকারী হয় কিংবা অ-ইয়াহুদীর ক্ষতিসাধন হয় এমন সকল ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ধোঁকা দেয়া শুধু বৈধই নয়, অপরিহার্য।

৮. অ-ইয়াহুদীর নিরাপত্তা এবং তার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করাও উচিত নয়।

৯. কোন ভূখণ্ড (হে ইয়াহুদীগণ!) তোমাদের অধীনে চলে আসলে সেখানকার সকল অ-ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলবে।

১০. যে ভূখণ্ডের উপর ইয়াহুদীদের আধিপত্য নেই, সে ভূখণ্ড নাপাক-অপবিত্র। কারণ সারাবিশ্বে কেবল ইয়াহুদীরাই পবিত্র আর অন্য সকল লোকেরা অপবিত্র।

পাঠক! বুঝতেই পারছেন, ইয়াহুদীদের দুনিয়াব্যাপী সকল অপকর্মের মূল উৎস তাদের ধর্মীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস। এ বিশ্বাস তাদেরকে মানবতার হন্তারক হতে প্ররোচিত করেছে। মানবতার এ নিধনযজ্ঞে তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল মিডিয়া।

সংখ্যায় কম হয়েও নিষ্ঠুরতা, টাকা-পয়সা ও মেধার বলে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমগুলোর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ আজ ইয়াহুদীদের হাতে। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই তারা কীটপতঙ্গের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। সত্যকে বিকৃত করা, বস্তুনিষ্ঠতার কবর রচনা করা এবং ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করায় ইয়াহুদী সাংবাদিকতার জুড়ি নেই। তারা ঘটনাকে নিজেদের সুবিধামত উপস্থাপন করে থাকে, এমনকি গোয়েবলসীয় কায়দায় অসংঘটিত ঘটনাকেও ঘটিত বলে চালিয়ে দেয়। তারা সারা বিশ্বে যে কোন মিত্র ব্যক্তিকে মিডিয়ায় উঁচু করে দেখাতে পারে। আবার শত্রুকে যে কোন মুহূর্তে জনসম্মুখে অপদস্ত করতে পারে। মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করতে পারা তাদের গর্ব। এই জঘন্য কর্মগুলো তারা একটি গোপন সংগঠনের মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাদের এই গোপন সংগঠনের নাম 'বিল্ডার বার্জ' অন্য বর্ণনামতে 'ফ্রি ম্যাসন'। এই সংস্থা সম্পর্কে জানা যায়, এর সদস্য না হয়ে কেউ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিংবা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না। এই ভয়ঙ্কর যায়নবাদী সংগঠন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আরবী সাপ্তাহিক আলমুজতামা লিখেছে, এটি ঐ সংস্থা যা বিশ্বের শাসকদের উপর শাসনের ছড়ি ঘোরায়।

উক্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। সদস্য সংখ্যা ১১৫ বা ১২০ জন। প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহুদী জোসেফ এইচ রোটিঙ্গা। সংস্থাটি সম্পর্কে তুরস্ক থেকে

প্রকাশিত আয্যামান পত্রিকায় স্থানীয় কিছু রাজনীতিবিদদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়ছে যে, এ সংস্থাটি অতি গোপন থাকার কারণ হল, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল প্রকার সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর শিকড় এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এক কথায় সারা পৃথিবীর খুন-খারাবী, সন্ত্রাসী আক্রমণ, কোন জাতির জয়-পরাজয়, গডফাদার এবং মাফিয়াচক্রের মূল হোতা হল এ সংস্থাটি।

৫ মে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক সম্বন্ধে পশ্চিমা গবেষক ব্যাপিস্টার গ্রাফিন লেখেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ব্যঙ্গ চিত্র রচনা করে এ কথা প্রমাণ হল যে, মুসলমানরা এখনো আমেরিকা ও ইসরাইলকে ঘৃণা করে। গ্রাফিন আরো লেখেন, সিরিয়া, ইরান ও লেবাননের ডেনমার্ক দূতাবাসে অগ্নিসংযোগ– এসব হঠাৎ করে হয়নি। বরং সিআইএ, এমআইসি এবং মোসাদের ভাড়া করা লোকদের মাধ্যমে এগুলো করানো হয়েছে, যারা আন্দোলনকারীদের সাথে মিশে গিয়ে এসব কাজ সম্পাদন করেছে।

বিশ্বের বুকে ইয়াহুদীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন 'যায়নিস্ট'। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীতে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ও ৩০ আগস্ট এক সম্মেলনের মাধ্যমে তার প্রাতিষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। উক্ত সম্মেলনে সারা দুনিয়াকে কন্ট্রোল করার সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র এবং নীল নকশা তৈরি করা হয়। বিশ্বের ৩০টি ইয়াহুদী সংগঠনের প্রায় ৩০০ জন ইয়াহুদী নেতা ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। তারা সকলে মিলে একটি ঐতিহাসিক প্ল্যান তৈরি করে, যা ২৪ প্রটোকল আকারে প্রণীত হয়। উক্ত প্রটোকলের একটি কপি এক খ্রিস্টান মহিলা চুরি করে বিশ্বের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সম্মেলনে গৃহিত একটি সিদ্ধান্ত এরূপ– পুরো বিশ্বকে কন্ট্রোল করতে হলে প্রথমত আমাদেরকে পৃথিবীর সকল স্বর্ণ ভাণ্ডার আয়ত্ব করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে নিয়ে আসতে হবে যাতে মিডিয়ার সাহায্যে আমরা বিশ্ববাসীর মগজ ধোলাই করতে পারি এবং এ পথে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। সেই প্রটোকলে আরো উল্লেখ আছে, আমরা ইয়াহুদীরা দুনিয়ার সকল আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো সংবাদ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কন্ট্রোল করব। যাতে করে বিশ্ববাসীকে আমরা যে চিত্র দেখাতে চাই তারা যেন সে চিত্রটিই দেখতে পায়। আমাদের ইচ্ছার বাইরে বিশ্বের কেউ যেন কোন সংবাদ প্রচার করতে না পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের নীতি হবে মুসলিম নিধন। তবে তার প্রকৃত সংবাদ মুসলমানরা কোনদিনই পাবে না। আর মুসলমানদের কোন সাফল্যের চিত্রও আমরা দেখাব না। আর এ লক্ষ্যেই তারা নিজেদের আরাম হারাম করে সকল সংবাদ সংস্থার মালিক হয়েছে। (সূত্র : ইয়াহুদী জাতি ও ইসরাঈল রাষ্ট্র)

রয়টার্স বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ সংস্থা। পৃথিবীর এমন কোন সংবাদপত্র, রেডিও সেন্টার ও টিভি সেন্টার নেই যারা রয়টার্স থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে না। বর্তমান বিশ্বের প্রধান দু'টি প্রচার মাধ্যম বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা। উভয়টির প্রায় নব্বই ভাগ সংবাদ তারা রয়টার্স থেকে সংগ্রহ করে থাকে। বিশ্ব বিখ্যাত এ সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার্স ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর এক ইয়াহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের শুরুতে একজন ব্যাংকার ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাংবাদিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

এছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য সংবাদ সংস্থা যেমন এপি, ইউপি, এএফপি ইত্যাদি সবই ইয়াহুদীদের ইঙ্গিতে চলে। ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিবিসি (ব্রিটিশ ব্রড কাস্টিং কর্পোরেশন) গোটা বিশ্বব্যাপী সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে তা বলাই বাহুল্য। এই বিবিসির পুরোটাই ইয়াহুদীদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা তো বিবিসি শোনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ি, মনে করি এটাই চূড়ান্ত সত্য। কিন্তু বাস্তবতা হল, তারা একদিকে মুসলমানদের হত্যা করবে আর অপরদিকে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিবে এবং মলম লাগানোর ফিকির করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে হিফাযত করুন।

আন্তর্জাতিকভাবে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের চক্রান্ত ও আমরা

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা যে মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার লোমহর্ষক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা গত ২৩ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের ব্লুসবার্গ দফতরের একটি সেমিনারের বক্তৃতা থেকে অনুমান করা যায়। একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক উক্ত সেমিনার সম্পর্কে লেখেন, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বিশ্বকে এক নতুন যুদ্ধে নামার ডাক দিয়েছেন। তিনি উক্ত সেমিনারে বক্তৃতাকালে বিশ্বব্যাপী ইসলামিস্টদের দমনাভিযানে বিশ্ব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। সাবেক প্রটেস্ট্যান্ট প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রিত্ব শেষে ভ্যাটিকানে রোমান ক্যাথলিক– ফেবকার ক্রুসেডার বলেছেন, ইসলামিস্টরা হল বিশ্বের স্থিতি ও অগ্রগতির পথে প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য চীন ও রাশিয়াকে সাথে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর যেসব সরকার ইসলামিস্টদের উপর দমনাভিযান চালাচ্ছে তাদের সমর্থন দিতে হবে, তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। টনি ব্লেয়ারের দৃষ্টিতে বিশ্ব সংকটের মূলে রয়েছে ইসলামের বৈপ্লবিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। টনি ব্লেয়ার চারটি অজুহাতে ইসলামিস্টদের দমনে বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছেন। প্রথম অজুহাতে তিনি বলেন, এখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মধ্যপ্রাচ্য বর্তমানে বিশ্বের জ্বালানী উৎপাদন ও সরবরাহের প্রধান ক্ষেত্র। দ্বিতীয় কারণ, ইউরোপের ঘরের কাছে মুসলিম দেশগুলো রয়েছে। যেমন বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার প্রভাব স্পেন, ইতালি ইত্যাদি দেশে পড়বে। তৃতীয় কারণ, ইসরাঈলের টিকে থাকা ও নিরাপত্তার জন্যই ইসলামিস্টদের দমন-পীড়ন গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ কারণ, ইসলামের ভবিষ্যত কী হবে তা নির্ধারিত হবে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি দিয়ে। আর ইসলামের রাজনীতি যেহেতু ধর্ম থেকে উৎসারিত হচ্ছে সেহেতু ধর্মের বিষয় বিবেচনায় আনতে হচ্ছে।

টনি ব্লেয়ারের উক্ত মন্তব্যের উপর বিখ্যাত কলামিস্ট অ্যানসেল পিফার যিনি ইসরাঈলের হার্টৎজ পত্রিকার সম্পাদক– বলেন, ইয়াহুদী প্রধানমন্ত্রী নেতা নিয়াহুর বক্তব্যের সঙ্গে ব্লেয়ারের বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত মিলে যায়। অন্যদিকে উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক, ইয়াহুদীবাদের কঠোর সমালোচক, মার্কিন ইয়াহুদী নোয়াম চমস্কি বলেন, যুদ্ধাপরাধের জন্য বুশ জুনিয়র ও টনি ব্লেয়ারকে বিচারের মুখোমুখি করা উচিৎ।

এছাড়াও সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও জাতিসংঘের বিশ্ব শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ দূত যুদ্ধবাজ ক্রুসেডর গর্ডন ব্রাউন তার রিপোর্ট প্রজেক্ট সিন্ডিকেট এভাবে লিপিবদ্ধ করেন যে, নাইজেরিয়ার বুকে মাদরাসা, নতুন আর ঝকঝকে। এখানে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ আছে। জঙ্গিবাদে যারা মদদ দেয় মধ্যপ্রাচ্যের এমন দেশগুলোর অর্থে চলে এ

মাদরাসাটি। শিক্ষার্থীরা তাই ছুটছে এখন মাদরাসার দিকে। সেখানে এই শিক্ষার্থীদের বিশেষ আদর্শের ব্যাপারে মগজ ধোলাই করা হয়। জঙ্গিবাদের সমর্থনে প্রচার চালানো হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে যে জঙ্গিবাদের উত্থান হচ্ছে তা আমার কাছে এজন্যই বিস্ময়কর নয়। উক্ত রিপোর্ট দ্বারাই বোঝা যায় আফ্রিকার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র নাইজেরিয়া যা এক সময় মুসলিম প্রধান ছিল, তা এখন কেন হাতছাড়া হয়েছে। আর ঝুঁকিতে থাকা দেশ কেবল নাইজেরিয়াই নয়; বরং বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম জনপদেরই এরূপ করুণ অবস্থা। (সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব; ২৮ জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ)

ব্রিটেনের যুদ্ধবিরোধী সংগঠন স্টপ দ্য ওয়ার কোয়ালিশনের আহবায়ক লিন্ডসে জার্মান পশ্চিমাদের আগ্রাসনের সমালোচনা করে লেখেন, আফ্রিকায় পশ্চিমা হস্তক্ষেপ এখন শিকড় গেড়ে বসেছে। ... বারাক ওবামার শিকারী ড্রোনগুলো পশ্চিম (আফ্রিকার) আকাশে চক্কর দিচ্ছে। নাইজেরিয়ায় ইতিমধ্যে সামরিক বাহিনী ঘাটি গেড়েছে। যার টার্গেট মালির সীমান্ত ও লিবিয়ার সীমান্ত দিয়ে তাদেরকে নিঃচিহ্ন করা। যা তারা ২০১১ খ্রিস্টাব্দে অবিরাম বোমা বর্ষণ করে দেখিয়েছিল। তাছাড়া আফ্রিকার জিবুতি, ইথিওপিয়া ও লোহিত সাগরের অপর পাড়ে ইয়েমেনের আকাশেও মার্কিন ড্রোন বিমান চক্কর দিচ্ছে। আর সোমালিয়াতে তারা যুদ্ধই শুরু করে দিয়েছে। তিনি আরো মন্তব্য করেন, আফ্রিকায় ক্রমবর্ধমান হারে ছড়িয়ে পড়া মুসলমান যদি পশ্চিমাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেটা সৃষ্টিতে পশ্চিমারাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। আর এই আধিপত্যবাদের সূত্র ধরেই তারা মিশরের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসিকে উৎখাত করেছে এবং তার দলকে নিষিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান সেনা প্রেসিডেন্ট সিসির গর্ভধারিণী একজন ইয়াহুদী মহিলা। যা ইয়াহুদী ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য প্রমাণ। যেমনটি তারা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে আলজেরিয়ার ইসলামী দলের বেলায়ও করেছিল। বর্তমানে তারা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকেও উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। কারণ প্রেসিডেন্ট এরদোগানই একমাত্র ইসরাঈলের বর্বর হামলা গাজা ট্রাজেডির প্রতিবাদ করে বলেছেন– ইয়াহুদী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হিটলারের চেয়েও জঘন্য এবং নিকৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, ভুইফোঁড় ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল পুরো ফিলিস্তিনই গিলে ফেলতে চাচ্ছে। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে শত বছর ধরে (১৯১৪ খ্রি.- ২০১৪ খ্রি.) ইয়াহুদীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে আশঙ্কাজনক হারে। অথচ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ইয়াহুদী ছিল হাতে গোনা কয়েক হাজার। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় বিশ হাজারে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোর এক পত্র মারফত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইয়াহুদীবাদীদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। সেই ভিত্তিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন শুরু করে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়াহুদীরা ব্রিটিশদের সহায়তায় ‘হাগানাহ’ নামক একটি গুপ্ত সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরি করে। তারা গোপনে ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত-খামার, দোকানপাট দখল করে সেখান থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়ন শুরু করে দেয়। আর এই সুযোগে ইয়াহুদীদেরকে অন্যান্য স্থান থেকে ধরে ধরে এনে বসতি করার অবাধ সুযোগ করে দেয়। যার ফলে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ইয়াহুদী ছিল মাত্র ৩৫ হাজার। সেখানে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র আট বছরের ব্যবধানে তাদের সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজারে পৌঁছে যায়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। শেষ হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় নাৎসি জার্মানী ও তার ফ্যাসিস্ট নেতা হের হিটলার যুদ্ধ চলাকালীন লাখ লাখ ইয়াহুদীকে গ্যাস চেম্বারে ও অন্যান্যভাবে হত্যা করেছিল বলে প্রচারণা চালানো হয়। এই মিথ্যা হত্যাযজ্ঞের প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত মজলুম ইয়াহুদীদের প্রতি বিশ্ববাসীকে সহমর্মী করে তোলা। মূলত সেই কথিত নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতেই তারা মিত্র বাহিনীর বিজয়ের পর ইয়াহুদীদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জোর দাবী তুলে ধরে। যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে দ্বিখণ্ডিত করে ১৮১ নং প্রস্তাবে স্বাধীন ইয়াহুদী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, মোট ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৫৫ শতাংশ পাবে ইয়াহুদী রাষ্ট্র। আর বাকি ৪৫ শতাংশ পাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। এভাবে ব্রিটিশদের ছত্রছায়ায় ১৫ মে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইসরাঈল নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তারপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪৭ বছরে ইয়াহুদীর সংখ্যা ৬ লাখ থেকে ৫৭ লাখে পৌছে যায়। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ইয়াহুদী শুমারী অনুযায়ী ইসরাঈলে মোট জনসংখ্যা ৮০ লাখ ৫১ হাজার ২০০ জন। ইসরাঈলের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিব্রু হলেও তাদের আরো ৩৫টি উপভাষা রয়েছে। উইকিপিডিয়ার হিসেব অনুযায়ী ইসরাঈলের বর্তমান আয়তন ১৮ হাজার ৬৭৩ বর্গমাইল। তবে তার নির্দিষ্ট কোন সীমান্ত নেই।

ফিলিস্তিনে বসবাসরত মুসলিম জনসংখ্যা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ছিল ১০ লাখ। উক্ত সংখ্যা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে হয় সাড়ে ১৭ লাখ। সম্প্রতি প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, ফিলিস্তিন বসতির বর্তমান আয়তন দৈর্ঘ্যে ২৪ মাইল, প্রস্থে ৪ মাইল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবধান হল ৯২ বছর। উক্ত সময়ে ফিলিস্তিনে মুসলমান সংখ্যা বেড়েছে মাত্র সাড়ে ৭ লাখ। অন্যদিকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৭৮ বছর। উক্ত সময়ে ইসরাঈলে লোকসংখ্যা বেড়েছে ৭৮ লাখ ৭১ হাজার। (সূত্র : দৈনিক নয়া দিগন্ত; ২২ আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ)

উল্লিখিত ফিলিস্তিন ভূখণ্ড এবং ইসরাঈল ভূখণ্ডের চলমান দখলকৃত আয়তনের পার্থক্যও জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির মতোই অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইসরাঈলের ভূমির বর্তমান আয়তন ১৮৬৭৩ বর্গমাইল। এই হিসেবে ফিলিস্তিনের আয়তন হওয়া উচিত (৫৫ : ৪৫ অনুপাতে) ১৫২৭৩ বর্গমাইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান ফিলিস্তিনের আয়তন মাত্র ৯৬ বর্গমাইল। সুতরাং এই ৯৬ বর্গমাইল ভূমিতে অবরুদ্ধ অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছে সাড়ে ১৭ লাখ ফিলিস্তিনি। তার মধ্য থেকে গত ৭ জুলাই শুরু হওয়া ইসরাঈলের বর্বর হামলায় ৫০ দিনে প্রায় তিন হাজার মুসলমান নারী-শিশু প্রাণ হারিয়েছে। ইসরাঈল বিশ্বের ৬ষ্ঠ সামরিক শক্তি। তাছাড়া তার রয়েছে অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে ফিলিস্তিনের রয়েছে শুধু পলায়নের টানেল বা সুড়ঙ্গ পথ আর নিক্ষেপের জন্য রকেট-ক্ষেপণাস্ত্র, যা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইসরাঈলের সামনে হাস্যকর ও খেলনার শামিল।

বোঝা গেল, অচিরেই ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনের নাম মুছে ফেলবে। যে জন্য তারা গাজায় ৫০ দিনের দীর্ঘ আক্রমণে প্রায় ৪৪০ কোটি ডলার পরিমাণ অপূরণীয় ক্ষতি করে এই শহরকে বিরান করে দিয়েছে। যা পূনর্বাসন করতে (দৈনিক নয়া দিগন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী) ৭৭০ কোটি ডলারের প্রয়োজন। আর সময় লাগবে ৫ বছর। অথচ বর্তমানে এই অসহায় মুসলমানদেরকে মুসলিম

কোন দেশ উল্লেখযোগ্য সহযোগিতাও করেনি। এমনকি কোন কোন দালাল মুসলিম দেশ নিজেদের গদি ঠিক রাখতে এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদও করেনি।

অভিশপ্ত এই ইয়াহুদী জাতি সারা দুনিয়ায় নিজেদের অস্ত্র সন্ত্রাস ও তথ্য সন্ত্রাস অব্যাহত রাখতে তাদের গুপ্তচর বাহিনী-মোসাদ, মাসুনী, ফ্রি ম্যাসন ইত্যাদি সংগঠনকে হরদম কাজে লাগিয়ে রেখেছে। উপরন্তু আরো নতুন নতুন সন্ত্রাসী সংগঠন গড়ে তুলছে যার লেটেস্ট প্রডাক্ট হল, 'শয়তান সম্প্রদায়'। কী ভয়ানক! নিজেরাই নিজেদের নাম রেখেছে শয়তান সম্প্রদায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আসল শয়তান ইবলিস এখন এদেরকে খিলাফত দিয়ে জান বাঁচাচ্ছে।

শয়তান সম্প্রদায়'র আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মিশরের কায়রোতে। এ সম্পর্কে ২৫ আগস্ট ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার একটি প্রসিদ্ধ দৈনিকে 'শয়তান সম্প্রদায়' নামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়, মিশরে শয়তানী সম্প্রদায় এক নতুন ফেতনার জন্ম দিয়েছে। দুই বছর আগে মিশরের একটি সংগঠন কায়রোতে একটি নাটক (ড্রামা) আরম্ভ করেছিল। তাতে কিয়ামতের আগমন, হযরত ঈসা (যীশুখ্রিস্ট) এর অবতরণ সম্পর্কিত সঠিক আকীদা-বিশ্বাস বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়। বিভ্রান্তিকর ধ্যান-ধারণা সম্বলিত এ ড্রামা সারা দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল। ফলে মিসর সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু তারপরও শয়তান সম্প্রদায়ের শয়তানী বাকি থাকে। যারা রীতিমত শয়তানের পূজা-অর্চনা করে আর প্রকাশ্যে খোদাদ্রোহী কাজ করে। তাদের পূজা-পদ্ধতি হল, দুনিয়ার সব অপরাধ-কর্ম সম্পাদন করা তাদের দায়িত্ব। এতে শয়তান তাদের প্রতি খুশি হন। ইত্যাদি... ইত্যাদি। (সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব; ২৯ আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ)

এ পর্যন্ত ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের কিঞ্চিত আলোচনা করা হল। তা শুনে অনেক দুর্বলমনা মুমিন সন্ত্রস্ত হতে পারেন যে, এমন ভয়ানক ষড়যন্ত্রের অক্টোপাশ থেকে কী করে বাঁচা সম্ভব হবে? আশার বিষয় হল, কুরআনুল কারীমের সূরা আনকাবূতে আমাদের জন্য এক সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জালের ন্যায়।' আল্লাহ তা'আলা এখানে চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, মাকড়সারা নিরীহ, নিরপরাধ সৃষ্টিজীব শিকারের অসৎ উদ্দেশ্যে জাল বুনতে থাকে। তারপর জাল বোনা শেষে বিকৃত আনন্দে জালে বসে দোল খায়। দু' একটা অসতর্ক শিকার তার ফাঁদে পা-ও দেয়। কিন্তু ঘর-দোর পরিষ্কারের সময় গৃহকর্তা যখন ঝাঁটার একটা মাত্র 'পরশ' বুলিয়ে দেয় মুহূর্তেই তার সব খেল খতম হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের কাজই হল মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য অহর্নিশ ষড়যন্ত্রের জাল বোনা। তারপর মুমিন যখন ঈমান-আমলের হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়াবে তখন নিমেষেই সব শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (অর্থ:) তোমরা হীনবল হয়ো না এবং উদ্বিগ্ন হয়ো না, তোমরাই জিতবে, যদি আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থাশীল হও। অন্যত্র ইরশাদ করেন, (অর্থ:) ওরা ষড়যন্ত্র আঁটল আর আল্লাহও এক কৌশল করলেন, বস্তুত আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী।

মুসলিম উম্মাহর করণীয়

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের উল্লিখিত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হলে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

১. আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভের স্বার্থে দীনদার হক্কানী উলামায়ে কেরামের পরামর্শ মাফিক কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে সাচ্চা মুমিনরূপে গড়ে তোলা এবং অধীনস্তদের ঈমান-আমল সংশোধনের নিরন্তর মেহনত চালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে কোনরূপ গাফিলতি না করা।

২. সকল প্রকার লোভ ও প্রলোভন এড়ানোর লক্ষ্যে বিলাসী জীবনের রাশ টেনে ধরা এবং সাধারণ ও কষ্টসাধ্য জীবন অভ্যস্ত হওয়া।

৩. সম্পদশালী মুসলমানগণ নিজ নিজ সম্পদের যাকাত সঠিকভাবে আদায়ের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য একটা পরিমাণ নফল দান হিসেবে গরীব-দুঃখিদের মাঝে বিতরণ করা। এতে মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত হবে এবং ধর্মান্তর ফেতনা রুখে দিবে।

৪. হালালভাবে অর্থ উপার্জন করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করা এবং বেকারত্ব থেকে বেঁচে থাকা। অলসতা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে বেশি থেকে বেশি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নিজেদের ঈমান মজবুত করা এবং জনসাধারণকে দীন মানার গুরুত্ব, ও এর ইহ-পরকালীন লাভ ও বরকত সম্পর্কে অবগত করা এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ দীনের ওপর ওঠানোর ফিকির করা।

৫. ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচলন ঘটানো। বিজাতীয় সংস্কৃতি বর্জন করা।

৬. প্রতিটি ইউনিয়ন ও গ্রামে, মকতব, মাদরাসা, মসজিদ নির্মাণ ব্যাপক করা এবং এগুলো সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা নিয়ে পরিচালনা করা। যেন এসব প্রতিষ্ঠান দীনের দূর্গে পরিণত হয়।

৭. বিজ্ঞ আলেমগণ জরুরী বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে বই-পুস্তক রচনা করবেন এবং পত্রিকা-ম্যাগাজিন প্রকাশ করত সহজভাবে সর্বসাধারণের হাতে ব্যাপকভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন।

৮. ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পণ্য যথাসাধ্য বর্জন করা এবং দেশীয় পণ্যের প্রসার ঘটানো।

৯. মানুষ নিজেও জানে না তার ভেতর কোন যোগ্যতা ও দক্ষতা লুকিয়ে আছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়ে তার দীনের কোন খিদমত আঞ্জাম দিবেন। দেখুন, একজন হুসাইন আহমদ মাদানীই কিন্তু সারা ভারতবর্ষ আযাদ করে দেখালেন, একজন আশরাফ আলী থানবীই শত বছরের দীনী সংস্কার সাধন করলেন এবং একজন ইলিয়াস রহ.-এর ফিকিরেই আজ সারা বিশ্বে দাওয়াত-তাবলীগের কাজ নিত্য প্রসারমাণ। এজন্য নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে হেলায়-ফেলায় নষ্ট না করা, যথাসাধ্য তা দীন ও উম্মাহর সেবায় কাজে লাগানো। আর জাতির কর্ণধার উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হবে, ধূলোয় লুটোপুটি খাওয়া এ সব প্রতিভাকে বুকে তুলে সযত্নে উজ্জ্বল করে তোলা– তা সে যে ময়দানেরই হোক। কে জানে, হয়তো এদের মাঝেই লুকিয়ে আছে যুগের সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যার হাতে আল্লাহ তা'আলা নতুন যুগের ডঙ্কা বাজাবেন, যে যুগ হবে শুধু এবং শুধুই ইসলামের। আল্লাহ তা'আলা সহায় হোন, আ-মীন।

লেখক: শিক্ষা সচিব, আল জামি'আ মদীনাতুল উলূম মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা, শিকদার মেডি ডেন্টাল কলেজ রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা।
ইমাম ও খতীব, পুলপাড় জামে মসজিদ, জাফরাবাদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

সমসাময়িক প্রসঙ্গ

নবীজীর ভালোবাসা ও সুন্নাতী যিন্দেগী

মাওলানা শফীকুর রহমান

হযরত সালমান মনসুরপুরী রহ. বলেন, নবীজীর মুহাব্বত হৃদয়ের শক্তি, রূহের খোরাক, চোখের শীতলতা, দেহের সজীবতা, অন্তরের জীবন, জীবনের সাফল্য, সাফল্যের প্রাণ। মোটকথা মুহাব্বতই সবকিছু। (ইশকে রাসূল; পৃষ্ঠা ৫)

মুহাব্বতের কারণ

সাধারণত কেউ কাউকে চারটি কারণে মুহাব্বত করে।

১. জামাল(সৌন্দর্য) ২. কামাল (যোগ্যতা) ৩. নাওয়াল (দয়া-অনুগ্রহ) ৪. কারাবাত (আত্মীয়তা)

জামাল (সৌন্দর্য) : সুন্দরের প্রতি মানুষ চিরকালই দুর্বল। সৌন্দর্যের আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া নিতান্তই কঠিন। মুহাব্বত-ভালোবাসার যত ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে তার অধিকাংশই সৌন্দর্যঘটিত। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল সৌন্দর্যের অনন্য সমাহার। নবীভক্ত হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রাযি. বলেন,

وأحسن منك لم ترقط عيني،
واجمل منك لم تلد النساء.
خلقت مبرأ من كل عيب،
كأنك قد خلقت كما تشاء.

অর্থ : আমার আঁখিযুগল আপনার চেয়ে সুন্দর কাউকে দর্শন করেনি। আপনার চেয়ে সুদর্শন কাউকে কোন নারী জন্মও দেয়নি। আপনাকে সকল প্রকার ত্রুটি মুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেন আপনি আপন চাহিদা মোতাবেক সৃজিত হয়েছেন। (রূহুল মা'আনী ১১/৬১)

হযরত আলী রাযি. বলেন,

من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.

অর্থ : কেউ হঠাৎ নবীজীকে দেখলে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। আর ক্ষণিক পরিচয়ে তার ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে যায়। তার অবয়ব আকৃতির বর্ণনা দানকারী এ কথা বলতে বাধ্য, আমি তার মত আর কাউকে দেখিনি; পূর্বেও না, পরেও না। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৬৩৮)

কামাল (যোগ্যতা) : যোগ্যতার প্রতিও মানুষ দুর্বল। বড় বড় শাইখুল হাদীস, পীর-মাশায়েখ, মুফতী-মুফাসসির, মুহাদ্দিস-মুদাররিস, ইমাম-খতীব ও ওয়ায়েয-বক্তাকে মানুষ ভালোবাসে তাদের বাহ্যিক আকৃতির কারণে নয়; তাদের চারিত্রিক গুণাবলী ও যোগ্যতাই সে ভালোবাসার কারণ। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন যোগ্যতার প্রশ্নে সকল আলোচনার উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

অর্থ : আর আপনি যা জানতেন না, তিনি (আল্লাহ) তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার উপর আল্লাহ তা'আলার অসীম করুণা রয়েছে। (সূরা নিসা-১১৩)

নাওয়াল (দান ও অনুগ্রহ) : মানুষ অনুগ্রহের দাস। মানুষকে যেন অনুগ্রহকারীর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই যে দিন-রাত মেম্বার-চেয়ারম্যান আর মন্ত্রী-মিনিস্টারদের পেছনে মানুষ ঘুরঘুর করে, তাদের গুণ কীর্তন করে বেড়ায়, এর অন্য কোন কারণ না থাকলেও দান-দক্ষিণার বিষয়টি অবশ্যই বিদ্যমান।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন উম্মাহর প্রতি সবচে বড় মুহসিন ও অনুগ্রহশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ... الخ

অর্থ : তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল আগমন করেছেন, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয়াদি নিতান্ত কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ। (সূরা তওবা-১২৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنما أنا قاسم والله يعطي.

অর্থ : আমি হলাম বণ্টনকারী, আর দানকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১)

কারাবাত (আত্মীয়তা) : মাতা-পিতা সন্তানকে আদর-সোহাগ করে, সন্তানেরা মাতা-পিতাকে ভক্তি-ভালোবাসা জানায়, অনুরূপ নিকটাত্মীয় নিকটাত্মীয়কে কদর-সম্মান করে– তার মূলে আছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন উম্মতের সবচে' বেশি আপন, সবচে' বেশি নিকটাত্মীয়।

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ.

অর্থ : নবী মুমিনদের কাছে তাদের আপন সত্তার চেয়েও বেশি প্রিয় আর নবীর স্ত্রীগণ হচ্ছে তাদের মা। (সূরা আহযাব-৬)

নবীজীর মুহাব্বত

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল, মানুষকে মুহাব্বত করার সবগুলো কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। উপরন্তু কুরআন ও সুন্নাহয় নবীজীকে মুহাব্বত করার নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ... الخ

অর্থ : বলুন! তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই-বেরাদর, তোমাদের পতি-পত্নী, তোমাদের গোত্র-বংশ, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর– আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তার রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর তাঁর বিধান (শাস্তি) আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। (সূরা তওবা-২৪)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.

অর্থ : তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে আমি তার নিকট বেশি প্রিয় না হই। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৫)

সুতরাং নবীজীর মুহাব্বত যুক্তির দাবি, কুরআনের আদেশ এবং ঈমানের আলামত।

নবীজীকে মুহাব্বত করার অর্থ

জুনায়েদ বাগদাদী রহ. বলেন, 'মুহাব্বতের অর্থ হল প্রেমাস্পদের পছন্দনীয় বস্তু গ্রহণ করা, যদিও তা নিজের কাছে অপছন্দ লাগে এবং তার অপছন্দনীয় বস্তু পরিত্যাগ করা যদিও তা নিজের কাছে পছন্দনীয় মনে হয়। এজন্যই বলা হয়, প্রেমিকজন

প্রেমাস্পদের বাধ্য হয়ে থাকে। (ইশকে রাসূল; পৃষ্ঠা ৮)

সুতরাং নবীজীকে মুহাব্বত করার অর্থ হল, তার অনুসরণ করা, তার আদর্শ গ্রহণ করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। নবীজী সাল্লাল্লাহু বলেন, 'যে আমার সুন্নাতকে যিন্দা করল সে আমাকেই ভালোবাসল। আর যে আমাকে ভালোবাসল সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে।' (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৭৮)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।' (সূরা নিসা-৬৪)

সুতরাং নবীজীকে মুহাব্বত করার অর্থ হল, তার সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়া ও তার আদর্শ মেনে চলা। এখন কেউ যদি নবীজীর আশেক হওয়ার দাবি করে এবং তার মুহাব্বতের দাবিদার হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে সুন্নাতী জীবন-যাপন করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় তা ধোঁকা ও প্রতারণা বিবেচিত হবে। কবি বলেন,

تعصى الرسول وانت تظهر حبه،
هذا لعمرى فى الفعال لبديع.
لو كان حبك صادقا لاطعته،
ان المحب لمن يحب مطيع.

অর্থ : তুমি রাসূলের অবাধ্যতা করছো, আবার তাকে ভালোবাসারও দাবি জানাচ্ছো। জীবনের কসম! বড় অভিনব তোমার দাবি! মুহাব্বত সাচ্চা হলে অবশ্যই তুমি তার আনুগত্য করতে। কারণ প্রেমিকজন প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে। (খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত ৩১/১১০)

সাহাবায়ে কেরামের মুহাব্বত

সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাআত। যারা নবীজীকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় নবীজীর সংশ্রব অবলম্বন করেছেন। সুখে-দুঃখে, ঘরে-বাইরে সর্বাবস্থায় নবীজীকে সঙ্গ দিয়েছেন। নিজেদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি নিজেদের প্রাণের চেয়েও তাকে বেশি ভালোবেসে নবীপ্রেমের বিরল সব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যা তাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত-অনুরক্ত ও অনুরাগী-অনুসারীর পরিচিতি দান করেছে। তাদের নবীপ্রেমের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীরও বর্ণনা শুরু করলে বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে।

উরওয়া ইবনে মাসউদের ঐতিহাসিক উক্তি

হুদায়বিয়া ঘটনায় উরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসী কাফেররা মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠিয়েছিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা, ইয্যত-সম্মান ও প্রেম-আসক্তির বহমান ঝর্নাধারা অবলোকন করে এক দিলজাগানিয়া অভিব্যক্তি পেশ করেছিলেন—

'হে আমার সম্প্রদায়! জীবনে বহু রাজা-বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিসরা-কায়সারের দরবারেও আমি গিয়েছি। নাজাশীর সাথেও আমার সাক্ষাত হয়েছে। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদকে তাঁর অনুসারীরা যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে কোনও রাজা-বাদশাহকে তার অনুসারীদের এই পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে দেখিনি। খোদার কসম! তিনি থুথু ফেললে তাঁর অনুসারীরা যমীনে পড়তে দেয় না, তাদের কেউ না কেউ তা লুফে নিয়ে নিজের চেহারা ও শরীরে মলে নেয়। কোন কাজের আদেশ দিলে তারা তা বাস্তবায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার উযূতে ব্যবহৃত পানি নিয়ে তারা কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয়। তিনি কথা বললে তন্ময় হয়ে শোনে। সম্মানের কারণে তাঁর দিকে চোখ উঠিয়েও তাকায় না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৫৮১)

এখন আমরা সাহাবায়ে কেরামের এমন কয়েকটি ঘটনা পেশ করবো, যেগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা কীভাবে নবীজীকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর সুন্নাতকে কীভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

১. ইবনে আবী শাইবা আতা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করছিলেন। এক পর্যায়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা বসে পড়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ছিলেন মসজিদের বাইরে রাস্তায়। তিনি নবীজীর আওয়াজ শোনামাত্র সেখানেই বসে পড়লেন। বয়ানের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তো বসতে বলেছিলাম তাদেরকে যারা মসজিদের কিনারায় ছিল, তুমি তো ছিলে রাস্তায়, তুমি কেন সেখানেই বসে পড়লে? তিনি বললেন, হুযূর! আপনার 'বসে পড়' কথাটি যখন কানে পৌঁছল, তখন আব্দুল্লাহর ক্ষমতা ছিল না যে, সে তার পা এক কদমও আগে বাড়াবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১০৯৩)

২. একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি পরিধান করলেন। তা দেখে সাহাবায়ে কেরামও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার শুরু করলেন। পরবর্তীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি কখনো আর এ আংটি ব্যবহার করব না। তখন সাহাবায়ে কেরামও তা ছেড়ে দেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪২২০)

৩. ইসলামের শুরু যামানায় একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ জিবরীল আ. এসে সংবাদ দিলেন যে, নবীজীর জুতা মুবারকে নাপাকী লেগে আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে নামাযের মধ্যেই জুতা খুলে ফেললেন। নবীজীর জুতা খোলা দেখে সাহাবায়ে কেরামও জুতা খুলে ফেললেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাদেরকে জুতা খুলতে উদ্বুদ্ধ করল? তারা বললেন, আপনাকে দেখেছি তাই। নবীজী বলেন, আমার জুতায় তো নাপাকী লেগে ছিল। কিন্তু তোমাদের ব্যাপার তো এমনটি নয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৬৫০)

৪. যায়েদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কে জামার বোতাম খুলে নামায পড়তে দেখলাম। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি নবীজীকে এমনটি করতে দেখেছি, তাই আমিও বোতাম খুলে নামায পড়ি। (সুনানে বাইহাকী; হা.নং ৩১১৩)

৫. হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় চুক্তির বিষয় চূড়ান্ত করার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হয়ে হযরত উসমান রাযি. মক্কায় তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে চাচাত ভাইয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। সকালে মক্কার সরদারদের সঙ্গে আলোচনা করতে যখন বাড়ি থেকে বের হলেন তখন তার পায়জামা নিসফে সাক পর্যন্ত উঠানো ছিল। নবীজীর সাধারণ অভ্যাস ছিল নিসফে সাক পর্যন্ত লুঙ্গি-পায়জামা উঠিয়ে রাখা। তখন হযরত উসমান রা.-এর চাচাত ভাই বলতে লাগল, জনাব! আরবদের নিয়ম হল, যার লুঙ্গি-পায়জামা যত বেশি টাখনুর নিচে লটকানো থাকবে তাকে তত বেশি বড় মাপের মনে করা হবে, এ কারণেই নেতারা লুঙ্গি পায়জামা ঝুলিয়ে পরে। এখন আপনি যদি এভাবে পায়জামা উঁচু করে তাদের কাছে যান,

তাদের দৃষ্টিতে আপনার কোন মর্যাদা বাকি থাকবে না এবং আলোচনায়ও আগ্রহ দেখাবে না। জবাবে হযরত উসমান রাযি. বললেন,

لا هكذا إزرة صاحبنا.

অর্থ : না, আমি এর চেয়ে নিচে নামাতে পারব না। আমাদের প্রিয় নবীর লুঙ্গি এমনই থাকে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৩৬৮৫২)

৬. হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. ছিলেন ইরান বিজেতা। যখন ইরানে কিসরার উপর হামলা করা হল তখন কিসরা আলোচনার জন্য হযরত হুযাইফা রাযি. কে রাজদরবারে আহ্বান করল। তিনি সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এক পর্যায়ে তার সামনে খানা পরিবেশন করা হল। তিনি আহার গ্রহণ শুরু করলেন। খানার মাঝে হঠাৎ হাত থেকে কিছু খানা নিচে পড়ে গেল। নবীজীর শিক্ষা হল, খাদ্যের কোন অংশ পড়ে গেলে তা উঠিয়ে প্রয়োজনে পরিষ্কার করে খাওয়া; সেটাকে নষ্ট না করা। কারণ, জানা নেই খানার কোন অংশে বরকত নিহিত থাকে। এ শিক্ষা অনুযায়ী হযরত হুযাইফা রা. পতিত খানা উঠানোর জন্য হাত বাড়ালেন। সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি কনুইয়ের মৃদু আঘাতে তাকে ইশারা করল– জনাব! একি করছেন? এটাতো পৃথিবীর সুপার পাওয়ার কিসরার রাজদরবার। এখানে পড়ে যাওয়া খাদ্য উঠিয়ে খেলে সম্মান মাঠে মারা যাবে। তারা আপনাকে নিচু জাতের লোক মনে করবে।

হযরত হুযাইফা রাযি. তখন এক বিস্ময়কর বাক্য উচ্চারণ করলেন। যা সর্বকালে মুসলিম উম্মাহর সাফল্যের চাবিকাঠির মর্যাদা রাখে। তিনি বললেন,

أأترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الحمقاء؟

অর্থ : তবে কি এসব নির্বোধ-বোকাদের খাতিরে আমি নবীজীর সুন্নাতকে ছেড়ে দেবো? কখনই না। চাই তারা ভালো মনে করুক অথবা খারাপ, সম্মান করুক বা উপহাস। আমার দ্বারা তো নবীজীর সুন্নাত ছেড়ে দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। (ইসলাহী খুতুবাত; পৃষ্ঠা ১৪৮)

সুন্নাতের ফযীলত

এটা অনস্বীকার্য যে, সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন তরীকা-পদ্ধতি, মত ও পথে শান্তি-সফলতা নেই। একমাত্র সুন্নাতে নববীর মধ্যেই রয়েছে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য ও কামিয়াবী। সর্বোপরি মহান রাব্বুল আলামীনের রেযা ও সন্তুষ্টি।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুহাব্বত করবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা আলে ইমরান-৩১)

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার প্রতিটি উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে; অস্বীকারকারী ব্যতীত। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হল সেই অস্বীকার করল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৮৫১)

৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিতনা-ফাসাদের যামানায় যে আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে সে শদীদের সওয়াব পাবে। (ত্বাবারানী আউসাত; হা.নং ৫৪১৪)

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। (মুআত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ১৫৯৪)

৫. এক সাহাবী নবীজীর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? নবীজী বললেন, তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? তিনি বললেন, প্রস্তুতি তো বেশি একটা নিতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করেছি। নবীজী বললেন, যার সাথে যার মুহাব্বত হবে তার সাথে তার জান্নাত হবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩২৫)

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত আমাদের ঈমানের অঙ্গ। মুহাব্বত করার সবগুলো কারণই তার মধ্যে বিদ্যমান। আর তাকে মুহাব্বত করার অর্থ হল, তার আদর্শ মেনে চলা, তার সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গড়া। যেমনটি গড়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, কেউ যদি দাবি করে, সে সাহাবায়ে কেরামের চেয়েও নবীজীকে বেশি ভালোবাসে, সে আসলে পাগল। আর সাহাবায়ে কেরামের মুহাব্বতের মধ্যে না ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী, না ছিল জন্মদিবস আর না প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম, না মীলাদ কেন্দ্রিক তাবারুক বিতরণ ও জশনে জুলূস। মুমিনের কর্তব্য হল, সে সাহাবায়ে কেরামের তরয ও তরীকায় নবীজীকে মুহাব্বত করবে এবং তার সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গড়বে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থ : তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব-২১)

লেখক: মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া। ইমাম, মসজিদে কুবা, মুহাম্মদী হাউজিং লি. মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(...সুস্থ রুচিবোধ; ৪৬ পৃষ্ঠার পর)

তালিবে ইলম ভাইদের খুব মনে রাখা উচিত, আপনাদের আসাতিযায়ে কেরামই আপনাদের ইলমী জীবনের সফলতার সোপান। তাদেরই নিভু নিভু প্রদীপের স্পর্শে আলোকিত হবে আপনাদের জীবন প্রদীপ। তাদেরই নূরের ছটায় আপনাদের অন্তঃকরণ হবে নূরান্বিত। যদি আপনি মনে করেন কোন বিকল্প উপায়ে কিংবা অন্য কোন প্রদীপের আলোয় জীবনের আলো গ্রহণ করবেন তবে তা নিতান্তই অসম্ভবের পথ।

ই'তিমাদ, ই'তিকাদ এবং ইত্তিহাদ

এ বিষয়টিও খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, তালিবে ইলম ভাইদের জন্য ইলমের সহীহ যওক-শওক তথা সঠিক আগ্রহ এবং রুচিবোধ তৈরির পন্থা হল আসাতিযায়ে কেরামের মজলিসে অংশগ্রহণ করা। তবে আশানুরূপ ফলাফলের জন্য শর্ত হল, আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি আস্থা, সুধারণা ও একাত্মতার সাথে মজলিসে উপস্থিত হওয়া। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মুখলিস-গাইরে মুখলিস, ভালো-মন্দ বরং মানুষ ও অমানুষের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। বরং এ ক্ষেত্রেও পার্থক্য নিরূপণের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ রুচিবোধের উপর নির্ভরশীল।

আজ দীনী মাদরাসাগুলোতে একটি অভাব বড় মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হল, আসাতিযায়ে কেরাম এবং তালিবে ইলমদের মাঝে সম্পর্কের দূরত্ব। মনে হয় যেন উভয়ের মাঝে রয়েছে মহাসাগরের ব্যবধান। অবস্থা এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষকতা এবং শিষ্যত্বের পরিধি কেবল দরসের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অভাব পূরণে এবং এ সমুদ্রের ব্যবধান ঘোচানো নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা এর মাঝেই মাদরাসাগুলোর সফলতা নিহিত।

অনুবাদক: শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

সীরাতুন্নবী-মীলাদুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দা.বা.

দু'টি শব্দের সমন্বয়ে সীরাতুন্নবী শব্দটি গঠিত। একটি হল 'সীরাত' অপরটি 'আননবী'। 'সীরাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ অবস্থা। পারিভাষিক অর্থ জীবনেতিহাস'। আর 'নবী' বলতে যে কোন নবীকে বোঝায়। কিন্তু 'আননবী' বলতে একমাত্র আমাদের মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝায়। এখানে 'সীরাত' এবং 'আননবী' শব্দ দু'টির সমন্বয়ে 'সীরাতুন্নবী' শব্দটি গঠিত হয়েছে। আরবী ভাষার পাঠরীতি অনুযায়ী এখানে সন্ধি হয়েছে। এ ধরনের সন্ধি বাংলা ভাষায়ও আছে। উদাহরণত 'বিদ্যা' এবং 'আলয়' শব্দ দু'টিকে একত্রে 'বিদ্যাআলয়' বলা হয় না; বরং 'বিদ্যালয়' বলা হয়। এখানে দ্বিতীয় শব্দ 'আলয়' এর প্রথম অক্ষর 'আ' সন্ধি হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে। ঠিক তেমনিভাবে আরবী পাঠরীতি অনুযায়ী 'সীরাত' এবং 'আননবী' শব্দ দুটি সন্ধিবদ্ধ হয়ে 'সীরাতুন্নবী' হয়েছে। এখন 'সীরাতুন্নবী' কথাটির অর্থ হল 'মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাস'। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাস হল ৬৩ বছরের পবিত্রতম জীবন।

মীলাদুন্নবীর অর্থ

কারো জীবনেতিহাস তার জন্ম বাদ দিয়ে শুরু হয় না। বরং জন্ম থেকেই শুরু হয়। জন্ম শব্দটিকে আরবীতে বলা হয় 'মীলাদ'। আর 'আননবী' অর্থ হল মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং মীলাদুন্নবী শব্দটির অর্থ হল, মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম।

সীরাতুন্নবী ও মীলাদুন্নবীর পার্থক্য

সীরাতুন্নবী ও মীলাদুন্নবীর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বোঝার পর দু'টির মাঝে আর কি কি পার্থক্য আছে তা বুঝে নেয়া দরকার।

প্রথমত, জন্মের ভেতরে সারা জীবনের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু সারা জীবনের ইতিহাসের ভেতর জন্মের কথাও আছে। সীরাতুন্নবী বিষয়ে যত গ্রন্থ লেখা হয়েছে সবগুলোর শুরুতেই মীলাদুন্নবীর আলোচনা আছে। কারণ মহানবীর জীবন চরিতের আলোচনা তাঁর জন্মের আলোচনা বাদ দিয়ে হয় না। পক্ষান্তরে মীলাদুন্নবীর অর্থই হল নবী আলাইহিস সালামের জন্ম, তাই মীলাদের বইগুলোতে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত ও জীবনাদর্শের আলোচনা পাওয়া যায় না। বোঝা গেল, সীরাতুন্নবীর ভেতরে মীলাদুন্নবী আছে, কিন্তু মীলাদুন্নবীর ভেতরে সীরাতুন্নবী নেই। যেমনিভাবে পাঁচের ভেতরে এক আছে, কিন্তু একের ভেতরে পাঁচ নেই। এক আর পাঁচে যে ব্যবধান মীলাদুন্নবী আর সীরাতুন্নবীতে সেই ব্যবধান।

দ্বিতীয়ত মীলাদুন্নবীর অর্থ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম। আর সীরাতুন্নবীর অর্থ মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাস। জন্মে আর জীবনীতে যে ব্যবধান, মীলাদুন্নবী আর সীরাতুন্নবীতে সেই ব্যবধান।

তৃতীয়ত মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম অর্থাৎ মীলাদুন্নবী হল একদিনের ঘটনা, আর সীরাতুন্নবী হল ৬৩ বছরের ঘটনা। এক দিনে আর ৬৩ বছরে যে ব্যবধান, সীরাতুন্নবী আর মীলাদুন্নবীতে সেই ব্যবধান।

চতুর্থত মীলাদুন্নবীর আলোচনা করা নফল, আর সীরাতুন্নবী কায়েম করা ফরয। সুতরাং নফলে আর ফরযে যে ব্যবধান মীলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবীতে সেই ব্যবধান।

পঞ্চমত মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম আলোচনার বিষয়, পালনীয় নয়। আর সীরাতুন্নবী পালনীয়। আর এ কথা সবাই জানি, আলোচনার সম্পর্ক হল কথার সঙ্গে, কাজের সঙ্গে নয়। আর সীরাতুন্নবী যা পালনীয়, তার সম্পর্ক শুধু কথার সঙ্গেই নয় ; বরং কথা আর কাজ মিলেই তা সম্পাদিত হয়। সুতরাং কথায় আর কাজে যে ব্যবধান, মীলাদুন্নবী আর সীরাতুন্নবীতে সেই ব্যবধান।

ষষ্ঠত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম যাকে আরবীতে মীলাদুন্নবী বলা হয় এটা আলোচনা করা যায়, পালন করা যায় না, উদযাপন করা যায় না, প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কেউ যদি মীলাদুন্নবী পালনের কথা বলে, উযদাপনের কথা বলে, প্রতিষ্ঠার কথা বলে, তা মিথ্যা হবে। কারণ আমাদের মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মো'জেযাপূর্ণ জন্ম জগতের অন্য কোন মানুষের হতে পারে না। হওয়া সম্ভবও নয়। তাহলে মীলাদুন্নবী কি পালন করা যাবে? প্রতিষ্ঠা করা যাবে? না, যাবে না। সুতরাং যারা মীলাদুন্নবী পালন করার কথা বলে তারা মিথ্যাবাদী। আর সীরাতুন্নবী আলোচনা করলেই শেষ হয়ে যায় না, তা কায়েম করতে হয়, পালন করতে হয়। তাই মীলাদুন্নবী শুধু আলোচনার ব্যাপার আর সীরাতুন্নবী পালন করার ব্যাপার, আমল করার ব্যাপার।

মীলাদুন্নবী পালনীয় নয় আলোচনার বিষয়

মীলাদুন্নবী শুধু আলোচনা করা যাবে, উদযাপন করা যাবে না কেন?

মীলাদুন্নবীর অর্থ মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের জন্ম। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, জন্ম কখনোই পালন করা যায় না, শুধু আলোচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের অলৌকিক ঘটনাগুলো অন্য কারো জন্মের বেলায় ঘটা মোটেও সম্ভব নয়। তাহলে জন্ম বা মীলাদুন্নবী কিভাবে পালন করবে, কিভাবে কায়েম করবে? কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

ক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খতনাকৃত এবং নাড়িকাটা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এভাবে জন্মগ্রহণ পৃথিবীতে অন্য কারো বেলায় সম্ভব নয়।

খ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভূমিষ্ঠ হওয়ার আলোচনায় মা আমেনা বলেন, 'আমি প্রসবকালে কোন রকমের কষ্ট অনুভব করিনি'। এভাবে মাকে কষ্ট না দিয়ে কি আপনার, আমার জন্ম হতে পারে?

গ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে দু'আ পড়েছিলেন। এটা কি অন্য কারো দ্বারা সম্ভব?

ঘ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন মক্কার মূর্তি পূজারীরা যেসব মূর্তিকে কা'বা ঘরের ভেতরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সেগুলো আল্লাহকে সেজদা করেছিল। অন্যের জন্মের সময়ও কি মূর্তিরা কি আল্লাহকে সেজদা করে?

ঙ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন পারস্যের অগ্নিপূজারীদের হাজার বছরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, যার তারা পূজা করত, নিভে গিয়েছিল। আপনাদের জন্মের সময়ও কি অগ্নিপূজারীদের আগুন নিভে যায়? তাহলে মীলাদুন্নবী কিভাবে করবেন? বোঝা গেল, যারা মীলাদুন্নবী প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারা প্রতারক। পক্ষান্তরে সীরাতুন্নবী যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাস তা আলোচনা করে বসে থাকলেই চলবে না, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা উম্মতের জন্য অপরিহার্য।

সীরাতুন্নবীর ব্যাপারে জঘন্যতম উক্তি

কিছু লোক আজকাল মীলাদুন্নবী যা কি না নফলের পর্যায়ে পড়ে শুধু তারই পক্ষপাতিত্ব করে। তাও হাদীসে যেভাবে আছে সেভাবে নয়; বরং মনগড়াভাবে। আর যে সীরাতুন্নবী পালন করা এবং যার অনুকরণ করা ফরয তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে। বরং মীলাদুন্নবী নিয়ে আজকাল সীমাহীন বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। নিম্নোক্ত স্লোগানগুলো থেকে তার কিছুটা আঁচ করা যায়। তারা বলে, 'মীলাদুন্নবী করতে হবে, সীরাতুন্নবী ছাড়তে হবে', 'মীলাদুন্নবী কায়েম করো, সীরাতুন্নবী বন্ধ করো'। কেউ কেউ তো আরো আগ বেড়ে বলে, 'মীলাদুন্নবী কায়েম করো, সীরাতুন্নবীতে লাথি মারো, (নাউযুবিল্লাহ)।

সীরাতুন্নবী তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম জীবনেতিহাস বন্ধ করা ও লাথি মারার মতো জঘন্য উক্তি করার দুঃসাহসিকতা কোন সাধারণ পথভ্রষ্টের দ্বারা সম্ভব নয়; বরং সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠের দ্বারাই এমনটি সম্ভব।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম তেষট্টি বছরের পবিত্রতম জীবনেতিহাস বন্ধ করার এবং লাথি মারার মত জঘন্যতম বাক্য কত বড় পাপিষ্ঠ হলে মানুষ উচ্চারণ করতে পারে?

আবূ জাহেল, আবূ লাহাবের মত কাফেররাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাসের ব্যাপারে এমন জঘন্য বাক্য উচ্চারণ করেনি। বরং তারা তাঁর নবুওয়াতপূর্ব চল্লিশ বছরের পবিত্রতম জীবনেতিহাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অতএব তাদের চেয়ে জঘন্যতম পাপিষ্ঠ না হলে কেউ এমন বাক্য উচ্চারণ করতে পারে না। এ জাতীয় জঘন্য উক্তি যা কুরআন ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে চরমভাবে আঘাত করে তা বোঝার জ্ঞানটুকুও বোধ হয় এদের লোপ পেয়েছে।

সীরাতুন্নবীকে অস্বীকার করার অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা

হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা রাযি. কে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল? আয়েশা রাযি. বলেন, ত্রিশ পারা কুরআন পাকে আল্লাহপাক যা অবতীর্ণ করেছেন তাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। ত্রিশ পারা কুরআনই সীরাতুন্নবী, আর সীরাতুন্নবীই ত্রিশ পারা কুরআন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৪১)

অতএব সীরাতুন্নবীকে অস্বীকার করা কিংবা এ ব্যাপারে কোন অসংলগ্ন বাক্য উচ্চারণ করা সরাসরি কুরআনে এবং নবীর নবুওয়াতে আঘাত করে (আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হিফাযত করুন)।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম জীবনেতিহাসের ব্যাপারে যারা এত জঘন্যতম বাক্য উচ্চারণ করে এবং যারা এ কাজে সাহস যোগাচ্ছে তারা মুসলমান সমাজে বাস করে কোন অধিকারে? এ ব্যাপারে নবীর উম্মত হিসেবে, ঈমানী দায়িত্বের খাতিরে সকল মুসলমানের সচেতন হওয়া জরুরী।

মোটকথা মীলাদুন্নবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম, এটা পালনীয় নয়, আলোচনার বিষয়। ফরয নয়, নফল। আর সীরাতুন্নবী পালন করা ফরয। ফরয বাদ দিয়ে নফল পালন করলে সে বুদ্ধিমান না বোকা? অবশ্যই বোকা।

এখন কেউ যদি নফল পালন করে আর ফরয বন্ধ করতে বলে কিংবা ফরযে লাথি মারতে বলে সে কোন ধরনের মুসলমান? স্পষ্ট করে বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

মাথায় টুপি দেয়ার পর তার উপরে পাগড়ী বাঁধা একটি সুন্নাত। বাধ্যতামূলক সুন্নাত নয়, ঐচ্ছিক সুন্নাত। পালন করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। কিন্তু অন্য কাপড় দিয়ে সতর ঢাকা, তা লুঙ্গি, পায়জামা যা দিয়েই হোক– ফরয। কেউ যদি সতরের কাপড় খুলে মাথায় পাগড়ী বাঁধে সে যে ধরনের বুদ্ধিমান এবং যে ধরনের মুসলমান, মীলাদুন্নবী পালন করার দাবি করে সীরাতুন্নবী বন্ধ করতে বললে সেও ঐ ধরনের বুদ্ধিমান, এবং ঐ রকমের মুসলমান। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প শুনুন–

এক বোকা লোক ওয়াজ শুনতে গিয়েছিল। আলেম ছাহেব সেদিন ওয়াজ করলেন, মাথায় পাগড়ী বেঁধে নামায পড়লে এক রাকাআতে সত্তর রাকাআতের সওয়াব হয়। এ কথা শুনে বোকা লোকটি বাড়ি ফেরার সময় পথিমধ্যে যখন নামাযে দাঁড়াল, সঙ্গে পাগড়ী না থাকায় পরনের লুঙ্গিটা খুলেই পাগড়ী বেঁধে ফেলল। বলুন তো এই আহমক কত রাকাআতের সওয়াব পাবে? না কি ঘোড়ার ডিম পাবে? পাগড়ী কি সে বাঁধেনি? বেঁধেছে এবং হয়তো ইখলাসের সাথেই বেঁধেছে কিন্তু কথা হল, যার সতর ঢাকা নেই তার পাগড়ী বাঁধারও মূল্য নেই। ঠিক তেমনিভাবে যার জীবনে সীরাতুন্নবীর ফরয নেই তার জীবনে মীলাদুন্নবীর নফল কাজের কোন দাম নেই, ঘোড়ার ডিম ছাড়া। বরং লুঙ্গি খুলে পাগড়ী বাঁধলে যেই সওয়াব, সীরাতুন্নবী ছেড়ে দিয়ে মীলাদুন্নবী করলে সেই সওয়াব!

আরেকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। এক সংখ্যাটি লিখে ডানে শূন্য দিলে দশ হয়। ডানের শূন্যটির মূল্য আছে কি না? নিশ্চয় আছে। এখন এই শূন্যের মূল্য দেখে বোকা লোকটি শূন্য রেখে বামের 'এক' সংখ্যাটি মুছে ফেলেছে। এখন নয় হয়েছে না জিরো হয়েছে? ঠিক তেমনিভাবে সীরাতুন্নবীর আদর্শে আদর্শবান হয়ে মীলাদুন্নবীর আলোচনা করলে নফল বন্দেগীর সওয়াব পাওয়া যায়। এ কথা শোনে কেউ যদি শুধু মীলাদুন্নবী, মীলাদুন্নবী জপ করে আর সীরাতুন্নবী বন্ধ করার দাবি করে সে শূন্য রেখে এক মুছে ফেলা ব্যক্তির মত ঘোড়ার ডিমের মালিক হয়।

কেবল গুণকীর্তনে নয়, আদর্শ গ্রহণের দ্বারাই নবীকে মানা হয়

নবুওয়াতপূর্ব চল্লিশ বছরে নবী আলাইহিস সালাম কাউকে দাওয়াত

দেননি। এজন্য দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনেতিহাসে আবূ জাহেলের দল নবী আলাইহিস সালামের দুশমন ছিল না; বরং তারা তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। জগৎশ্রেষ্ঠ, আমানতদার, সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু এরপর তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন যে, আল্লাহকে লা-শারীক মানতে হবে, মুহাম্মাদকে রাসূলুল্লাহ বলে বিশ্বাস করতে হবে, নামায পড়তে হবে, রোযা রাখতে হবে, হজ্জ করতে হবে, যাকাত দিতে হবে, ঘুষ ছাড়তে হবে, সুদ ছাড়তে হবে, মদ ছাড়তে হবে ইত্যাদি,ইত্যাদি। অর্থাৎ যখন কাজে-কর্মে সীরাতুন্নবীর আদর্শ গ্রহণের সময় এল, তখন থেকেই তারা বেঁকে বসল। তাহলে বোঝা গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুধু মৌখিক গুণ গাইলে, আর সীরাতুন্নবী বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করার কথা শোনে বেঁকে বসলে যদি আশেকে রাসূল হওয়া যেত তাহলে আবূ জাহেল, আবূ লাহাবের দল এ বিশ্বের সব মানুষের চেয়ে বড় আশেকে রাসূল সাব্যস্ত হতো।

বর্তমান আশেকে রাসূলদের অবস্থা

আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মে বা মীলাদুন্নবীতে খুব আনন্দ-ফুর্তি করে। আবার কিছু লোক আছে, যারা নবীর মুহাব্বতে জান পর্যন্ত দিতে চায়। আবার কিছু লোক এমনও আছে, যারা শুধু মৌখিকভাবে নবীর গুণ গায়। কিন্তু এরা কেউ সীরাতুন্নবীর আদর্শ গ্রহণ করতে রাজি নয়। এই তিন স্বভাবের লোক নবীর যুগেও বিদ্যমান ছিল এবং এ যুগেও আছে। একটু খুলে বললে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে আসবে।

মীলাদুন্নবীভক্ত আবূ লাহাবের পরিণতি

চাচা আবূ লাহাব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করেছিল। নবীজী যখন জন্ম গ্রহণ করলেন, আবূ লাহাবের দাসী সুওয়াইবা আবূ লাহাবকে সুসংবাদ দিল। নবী আলাইহিমুস সালামের জন্মের সংবাদে আনন্দিত হয়ে আবূ লাহাব তার মহামূল্যের এ দাসীকে চিরদিনের জন্য মুক্ত করে দিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মে যারপরনাই খুশি হওয়া সেই আবূ লাহাবের কাছে যখন হুযূরের জীবনাচার গ্রহণ করার দাওয়াত পৌঁছল তখন সে বেঁকে বসল। সেই ঘটনা শুনুন-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর এক বিশেষ নির্দেশে তার নিকটাত্মীয়দেরকে পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানালেন। আবূ লাহাবসহ নিকটাত্মীয়রা সমবেত হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে একদল শত্রু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? আবূ লাহাবসহ সবাই একবাক্যে জবাব দিল, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। তুমি আল-আমীন। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে কোন দিনও মিথ্যা বলনি। তুমি বললে আমরা তা অবশ্যই বিশ্বাস করব। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আমাকে যদি তোমরা এত বড় সত্যবাদী বলে স্বীকার কর তবে শোন, আমি আজ তোমাদেরকে একটি পরম সত্য কথা শোনাবার জন্য এখানে ডেকেছি। যদি তোমরা পরকালের চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে নাজাত পেতে চাও, আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করা ছেড়ে দাও।'

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবূ লাহাব একখণ্ড পাথর নিয়ে নবীজীর মাথা মুবারকে আঘাত করতে উদ্যত হল এবং বলল,

تبا لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا.

অর্থ : এমন একটি অধর্ম কথা শোনাবার জন্য আমাদের সময় নষ্ট করলে, বিনিময়ে তোমার সারাদিন ধ্বংস হোক। (সীরাতে মুস্তাকীম ১/১৭২)

এর প্রতিবাদে পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা লাহাব অবতীর্ণ করে বললেন,

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.

অর্থ : আমার নবীর সারাদিন ধ্বংস হবে না। আবূ লাহাবেরই ইহকাল-পরকাল ধ্বংস হবে। আমার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আবূ লাহাবকে তার ধন-সম্পদও রক্ষা করতে পারবে না, তার সন্তান-সন্ততিও রক্ষা করতে পারবে না। (সূরা লাহাব-১, ২)

আবূ লাহাব নবীর জন্মে মহামূল্যের দাসীকে চিরকালের জন্য মুক্ত করে খুশি প্রদর্শন করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাবে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছেন। নবীর জন্মে আনন্দ প্রকাশ করা সত্ত্বেও আবূ লাহাব চিরস্থায়ী জাহান্নামী কেন? এর একমাত্র কারণ, শুধুমাত্র মীলাদুন্নবী দ্বারা জান্নাতে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। জান্নাত পাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা সীরাতুন্নবীর আদর্শ গ্রহণ করা। সীরাতুন্নবী বাদ দিয়ে শুধু মীলাদুন্নবীর দ্বারা যদি আশেকে রাসূল হওয়া যেত এবং জান্নাতে যাওয়া যেত তাহলে আবূ লাহাব সবচেয়ে বড় আশেকে রাসূল সাব্যস্ত হতো এবং সর্বাগ্রে জান্নাতে চলে যেত। কিন্তু আবূ লাহাব চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

আশেকে রাসূল আবূ তালেবও চিরস্থায়ী জাহান্নামী

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের আরেক চাচার নাম ছিল আবূ তালেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আব্দুল্লাহ ও দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর আবূ তালেব যখন আমাদের নবীর অভিভাবক হলেন, কুরাইশ বংশের মূর্তি পূজারী সর্দাররা আবূ তালেবের কাছে নালিশ জানাল– তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদ আমাদের বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করে, আমাদের মাবূদগুলোকে মন্দ বলে। তোমার মত সর্দারের ভাতিজা হওয়ার কারণে এতদিন আমরা বরদাশত করেছি। হয় তুমি তাকে বুঝিয়ে এ কাজ থেকে বিরত রাখো, নতুবা আমাদের কাছে সোপর্দ করে দাও। আবূ তালেব নবীজীকে বললেন, ভাতিজা! সর্দাররা আমার কাছে তোমার নামে অভিযোগ দায়ের করেছে। তুমি আমাদের দেবতাদেরকে আর মন্দ বলো না, ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তাদের কাছে আর যেও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবূ তালেবের কথার জবাব না দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু মুবারক দিয়ে দরদর করে পানি পড়তে লাগল। তখন আবূ তালেব বললেন, ভাতিজা! আমার কথার জবাব না দিয়ে কাঁদছ কেন? তোমার চোখের পানি বরদাশত করতে পারি না। বরং তোমার জন্য তো আমি জান দিয়ে দিতে পারি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাচাজান! মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যই আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার সহযোগিতায় থাকুন আর না থাকুন, যে কাজের জন্য আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছেন সে কাজ তো আমাকে করতেই হবে। তখন আবূ তালেব বললেন, যাও, তুমি তোমার কাজ করতে থাক। যে সব সর্দার তোমাকে শায়েস্তা করার হুমকি দিচ্ছে, কথা দিলাম, আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা অবস্থায় এদের কাউকে তোমার শরীরে আঘাত

করতে দেব না। তোমাকে আঘাত করতে হলে আমাকে হত্যা করতে হবে।

এ ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে গেল, আবূ তালেব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। সেই আবূ তালেবের জীবনে যখন সীরাতুন্নবীর আদর্শ গ্রহণ করার প্রশ্ন আসল তখন সে বেঁকে বসল।

আবূ তালেবের মৃত্যুশয্যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার শিয়রে বসে বললেন, চাচাজান! শুধু একটিবার মুখে স্বীকার করুন যে, আপনি আমার জীবনাচার গ্রহণ করেছেন, আমার দীন গ্রহণ করেছেন। কাল হাশরের মাঠে আমি আল্লাহকে বলব, হে আল্লাহ! আমি আমার চাচা আবূ তালেবকে সঙ্গে নিয়ে জান্নাতে যেতে চাই। উত্তরে আবূ তালেব বললেন,

اخترت النار على العار.

অর্থ : ভাতিজা মুহাম্মাদ! তোমার দীন-তোমার জীবনাচার গ্রহণ না করলে পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না এ কথা আমি ভালোভাবেই জানি, কিন্তু মরণকালে যদি আমি তোমার দীন গ্রহণ করি, তাহলে কুরাইশ বংশের লোকেরা আমার সর্দারীর নামে ধিক্কার দেবে যে, আবূ তালেবের মত সর্দার মরণকালে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ভাতিজার ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ ধিক্কারের পরিবর্তে দুনিয়াতে আমার সুনাম বজায় থাকুক। বিনিময়ে জাহান্নামের আগুনকেই আমি গ্রহণ করে নিলাম। (তাফসীরে জালালাইন ২/৩৩২)

নবী আলাইহিস সালাম অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। নবী আলাইহিস সালাম মর্মাহত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

অর্থ : হে মুহাম্মাদ! আবূ তালেব আপনার মুহাব্বতের চাচা। কিন্তু সে আপনার সীরাতের আদর্শ গ্রহণ করতে রাজি নয়, আপনার তরীকা ও দীন গ্রহণ করতে রাজি নয়। সুতরাং এ আবূ তালেবকে আপনি ঈমানদার বানাতে পারবেন না, আপনি তাকে জান্নাতেও নিয়ে যেতে পারবেন না। (সূরা কাসাস-৫৬)

হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরকালে জাহান্নামে আমার চাচা আবূ তালেবের পায়ে আগুনের তৈরি দু'টি জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। জুতার আগুনের উত্তাপে তার মাথার মগজ পর্যন্ত বুদ্‌বুদের মত টগবগ করে উথলাতে থাকবে এবং এ আযাবে সে চিরকাল থাকবে। সুতরাং সীরাতুন্নবীর আদর্শ গ্রহণ না করে নবীজীর মুহাব্বতে জান দিতে রাজি থাকলেও যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যেত তাহলে সবার আগে আবূ তালেব নাজাত পেয়ে যেত। কিন্তু আবূ তালেবও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

একটি প্রশ্নের উত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.

অর্থ : তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলকে নিজের পিতা, নিজের পুত্র এবং সমগ্র জগতবাসীর চেয়ে বেশি মুহাব্বত না করবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৫)

আবূ তালেব তো নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাব্বত করেছিল, তারপরও ঈমানদার হতে পারল না কেন? কারণ মুহাব্বত দুই প্রকার।

১. নবীর দীন, তরীকা ও আদর্শ নিজের জীবনে নিজে গ্রহণ করার মাধ্যমে নবীকে মুহাব্বত করা।

২. নবীর দীন ও তরীকা বাদ দিয়ে নবীকে মুহাব্বত করা।

আবূ তালেবের মধ্যে নবীর মুহাব্বত ছিল, কিন্তু সে নবীর দীন ও আদর্শ গ্রহণ করতে রাজি ছিল না।

অতএব কেউ যদি এমন হয় যে, সীরাতুন্নবীর আদর্শ গ্রহণ করতে রাজি নয়, অথচ নবীর মুহাব্বতে জান দিতে প্রস্তুত– তাদের এ মুহাব্বতের বিনিময়ে পরকালে আবূ তালেবের মত ফলাফল ছাড়া কিছুই মিলবে না।

বয়ানের শুরুতে আমি যে হাদীসখানা তিলাওয়াত করেছি সে হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.

অর্থ : আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে, কিন্তু যারা অস্বীকার করে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে নবী! অস্বীকারকারী কারা? নবী আলাইহিস সালাম বললেন, যারা আমার সীরাত ও আদর্শের অনুকরণ করে, তারা আমাকে মান্য করে, তারাই আমার সঙ্গে জান্নাতে যাবে। আর যারা সীরাতুন্নবীর আদর্শ গ্রহণ করে না, তারা আমাকে অস্বীকার করে, সুতরাং তারা জান্নাতে যাবে না। (সহীহ বুখারী; ২/১০৮১ হা.নং, মিশকাত ২৭)

মীলাদুন্নবী উপলক্ষে নবীজীর আমল

এখন জানার বিষয় হল, যে নবীর ইশক ও মুহাব্বতের নামে এত জাঁকজমকভাবে ঈদে মীলাদুন্নবীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, এ মীলাদুন্নবী উপলক্ষে নবী আলাইহিস সালামের কোন আমল ছিল কি না? *সহীহ মুসলিম*-এর হাদীসে উল্লেখ আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সোমবার নফল রোযা রাখতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি প্রতি সপ্তাহের সোমবারে নফল রোযা রাখেন কেন? জবাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'টি কারণে আমি সপ্তাহের সোমবারে রোযা রাখি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন দুটি কারণে আপনি প্রতি সোমবার নফল রোযা রাখেন? জবাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথম কারণ হল, সর্বপ্রথম যেদিন আমার কাছে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছিল সে দিনটি ছিল সোমবার। এজন্য প্রতি সোমবার নফল রোযার মাধ্যমে আমি প্রথম কুরআন অবতীর্ণের শুকরিয়া আদায় করি। দ্বিতীয় কারণ হল, আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলাম সে দিনটিও ছিল সোমবার। এজন্য আমি প্রতি সোমবারে নফল রোযা রাখার মাধ্যমে আমার জন্মের শুকরিয়া আদায় করি।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন এ ধরণীর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। বিশ্ববাসীর জন্য এর চেয়ে আনন্দদায়ক ও অবিস্মরণীয় ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না। তাই যদি জন্ম দিবস পালনের কোন বৈধতা বা সুযোগ ইসলামে থাকত বা এটা ইশকে রাসূলের মাপকাঠি হত তাহলে অবশ্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করার জন্য বলতেন বা ইঙ্গিত প্রদান করে যেতেন। কিন্তু নবুওয়াতের দীর্ঘ তেইশ বছরের জীবনে নবীজী নিজে তার জন্মবার্ষিকী পালন করেছেন বা কাউকে পালন করতে বলেছেন মর্মে হাদীসের কিতাব থেকে কেউ একটি প্রমাণও দেখাতে পারবে না।

রবিউল আউয়ালে সাহাবায়ে কেরামের আমল

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি

ইশারায় নিজেদের জীবন উৎসর্গের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী পবিত্র জামাআত, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূতঃপবিত্র চরিত অনুসরণের এমনকি তাঁর একেকটি অঙ্গভঙ্গির অনুকরণের এত বেশি অনুরাগী ছিলেন যে, স্বীয় জান-মাল, আবেগ-অভিলাষসমূহ কুরবান করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। নিজের প্রতিটি উঠাবসাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার চিন্তায় ব্যাকুল থাকতেন। তাদের অনুসরণের ব্যাকুলতা এত অধিক ছিল যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার সময় সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বসে পড়ো'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. দরজার কাছে আসতে এই নির্দেশ শুনতেই আর সামনে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করেননি বরং সেখানেই বসে পড়লেন। হযরত খুবায়েব রাযি. ফাঁসির মঞ্চে নিজের জীবনের বিনিময়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পায়ে কাঁটা বিঁধুক এমন প্রস্তাব শুনতে পর্যন্ত রাজি ছিলেন না। সাহাবায়ে কেরামের একটি দল উহুদের ময়দানে হুযূরকে কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে তীর বৃষ্টির সামনে নিজের শরীরকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে আনন্দ চিত্তে শাহাদাত গ্রহণ করেন। আক্রমণের তীব্রতা এমনই ছিল যে, তাদের চেহারা দেখে সনাক্ত করারও উপায় ছিল না। যারা নিজেদের কোলের ছোট্ট শিশুকে জিহাদের জন্য এ বলে হুযূরের সামনে পেশ করেন, যদিও কোলের এ শিশুটি এর উপযুক্ত নয়, কিন্তু নবীজীর দিকে নিক্ষেপিত প্রতিটি তীরের সামনে যেন আমার কলিজার টুকরা ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি বিষয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ করতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের উদ্দেশ্য অর্জনে তারা তাদের পুরো জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। হুযূরের নির্দেশিত পথে আমল করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

সাহাবায়ে কেরামের চেয়েও বড় আশেকে রাসূল!

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় সোয়া লক্ষ খাঁটি আশেকে রাসূল সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনার ভিত্তিতে নবী প্রেমিক এসব সাহাবী থেকে এমন একজনও পাওয়া যাবে না যারা কখনো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস পালন করেছেন বা এ দিন উপলক্ষে সভা-সমাবেশ, মিছিল, জশনে জুলুস, আলোকসজ্জা বা কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা দেখিয়েছেন। কেননা বিদ'আত, কুসংস্কার বা কোন প্রকার প্রদর্শনী সাহাবায়ে কেরামদের জীবনে ছিল না। মীলাদুন্নবী উপলক্ষে তারা কিছু করেছেন বা করার জন্য বলে গিয়েছেন, এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তাহলে কি সাহাবায়ে কেরমের চেয়েও আমরা বড় আশেকে রাসূল হয়ে গেলাম? অথচ এ কথায় সবাই একমত যে, সাহাবায়ে কেরামদের চেয়ে বড় আশেকে রাসূল এ পৃথিবীতে আর কেউ হতেই পারে না। যদি কেউ এ কথা প্রমাণ করতে চায় তাহলে বুঝতে হবে, সে জঘন্য ধোঁকাবাজ ও মিথ্যুক।

তেমনিভাবে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণের এমন একজনও পাওয়া যাবে না, মীলাদুন্নবী উপলক্ষে যারা কিছু করেছেন বা করার জন্য বলে গেছেন। তাহলে কি তাদের চেয়েও আমরা বড় আশেকে রাসূল হয়ে গেলাম!

যে আমল তিন যুগে প্রমাণিত নয় তা অগ্রহণযোগ্য

ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতির ভিত্তিতে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এ তিন যুগে যে আমলটির প্রয়োজন ও কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সোনালী সেই তিন যুগে তা প্রমাণিত না হয় এমন আমলকে শরীয়তে বিদ'আত বলা হয়। যেহেতু প্রায় ছয়শত বছর পর্যন্ত ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষে কোন প্রকার মিছিল, মিটিং, জশনে জুলুস ইত্যাদির অস্তিত্বই পাওয়া যায় না, তাই এসব আমল বিদ'আত হিসেবেই গণ্য হয়। এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের থেকে প্রমাণিত নয় তা অগ্রহণযোগ্য। (সহীহ বুখারী; ১/১০১২, সহীহ মুসলিম; ২/৭৭, মুসনাদে আহমাদ; ৬/১৪০)

বিদ'আত সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম; ১/২৮৫, মিশকাত; ১/১২৭)

যে ব্যক্তি নিজে কোন বিদ'আত করল অথবা কোন বিদ'আতিকে আশ্রয় দিল, তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা এবং সব মানুষের লানত পতিত হোক। তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয়। (সহীহ বুখারী; ১/১৫১, সহীহ মুসলিম; ১/১৪৪)

যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতিকে সম্মান করল সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করতে সহযোগিতা করল। (মিশকাত; ১/৩)

নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক বিদ'আতীর উপর তওবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৮৯)

কারণ গুনাহকে গুনাহ মনে করে করলেই বান্দার অন্তরে তওবার চিন্তা আসে। কিন্তু বিদ'আতী বিদ'আতকে সওয়াবের নিয়তে করে থাকে।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, মীলাদুন্নবী উপলক্ষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই মীলাদুন্নবী নামে কোন ঈদ পালন করেননি বা করার কথাও বলেননি। কোন হাদীসে তা পাওয়া যায় না এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকেও মীলাদুন্নবী উপলক্ষে কোন ঈদ প্রমাণিত হয়নি। বরং মীলাদুন্নবী উপলক্ষে নবী আলাইহিস সালাম প্রতি সোমবার নফল রোযা রাখতেন।

জন্ম তারিখ উদযাপন নবীজীর আদর্শ নয়

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, একটি হল মীলাদুন্নবীর দিবস, আরেকটি হল মীলাদুন্নবীর তারিখ। মীলাদুন্নবীর দিবস হলো সোমবার। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী মীলাদুন্নবীর তারিখ হল ১২ রবিউল আউয়াল। প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবারে হয় না। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীলাদুন্নবীর তারিখ বর্জন করেছেন এবং মীলাদুন্নবীর দিবসে অর্থাৎ সোমবারে নফল রোযা পালন করেছেন।

মীলাদুন্নবী উপলক্ষে নবী আলাইহিস সালাম রোযা রেখেছেন। আর আমরা মীলাদুন্নবী উপলক্ষে ঈদ পালন করি। অথচ ঈদ আর রোযা সম্পূর্ণ বিপরীত আমল। অর্থাৎ রোযা রাখতে হয় না খেয়ে, আর ঈদ পালন করতে হয় খাওয়া-দাওয়া ধুমধামের মধ্য দিয়ে। এভাবে সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের বিরোধিতা করার পরও কি কাউকে নবীর আদর্শে আদর্শবান বলা যাবে? কখনোই না।

মূলত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন, সীনা মুবারক বিদীর্ণ করা, হেরা গুহায় অবস্থান, ঐশী নূরের আত্মপ্রকাশ, নবুওয়াত প্রাপ্তি, মক্কা থেকে হিজরত, সাওর গুহায় তিনদিন অবস্থান, বদরের রজনী, এসবের প্রত্যেকটি দিন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৬৩ বছর জীবনের এবং প্রতি বছরের ৩৬০ দিনের কোন্ দিনটি এবং কোন্ সময়টি এমন রয়েছে যা স্মরণীয় নয়?

(২১ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

বড়দের জীবন

মাওলানা আতহার আলী রহ. : জীবন ও কর্ম

মাওলানা রফীকুল্লাহ দা. বা.

উপমহাদেশে ক্ষণজন্মা এমন অনেক বুযুর্গ মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন যাদের কথা স্মরণ হলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর যুগ মনে পড়ে যায়। ইখলাস, লিল্লাহিয়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা, সরলতা, তুষ্টতা, ইসলাহ, ইরশাদ, দীনী দূরদর্শিতা ইত্যাদি সমস্ত গুণে তারা গুণান্বিত ছিলেন। ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করা, মুসলমানদের ঈমানী চেতনার উৎস দীনী মাদারিস গড়ে তোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাদের অবদান কোন দিন ভোলা যাবে না। মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. এঁদেরই একজন।

জন্ম, শিক্ষা ও শিক্ষকতা

হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. সিলেটের বিয়ানীবাজার থানার ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও দীনদার পরিবারে ১৩০৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অল্প বয়সেই গ্রামের মকতবে শিক্ষা জীবনের শুরু। তার সম্মানিত পিতা সেখানে শিক্ষক ছিলেন। তার সযত্ন তত্ত্বাবধানে তিনি কুরআনে কারীম নাযেরা শেষ করে গ্রামের মাদরাসাতেই প্রাথমিক উর্দূ ও ফার্সী এবং দেশের বিভিন্ন মাদরাসায় সুযোগ্য আসাতিযায়ে কেরামের কাছে আরবী শিক্ষা গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে একজন হলেন, হযরত মাওলানা ইবরাহীম তশনা রহ., যার ফানাফিল্লাহ-এর মর্তবা ছিল। আরেকজন হলেন, হযরত মাওলানা আব্দুল বারী রহ.। তাদের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ায় তার মধ্যে অসাধারণ উন্নতি দেখা যায়। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক আরবী শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আরো গভীর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে মাদরাসায়ে কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদ পরে মোযাহিরুল উলূম সাহারানপুর এবং সবশেষে মাদরাসায়ে আলিয়া রামপুরে ভর্তি হন। শিক্ষা সমাপ্তির উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দে গিয়ে শাইখুল হাদীস ইমামুল আসর হযরতুল আল্লাম মাওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর সান্নিধ্যে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

দাওরায়ে হাদীসের আসাতিযায়ে কেরাম

১. যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিসকুল শিরোমনি হযরতুল আল্লাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.।

২. শাইখুল ইসলাম হযরত শাব্বীর আহমাদ উসমানী দেওবন্দী রহ.।

৩. জামিয়ে মা'কূল ওয়াল মানকূল (প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও মহাপণ্ডিত) হযরত মাওলানা রাসূল খান ছাহেব রহ.।

৪. মানতিকশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত হযরত মাওলানা ইবরাহীম ছাহেব বালিয়াবী রহ.।

৫. শাইখুল ফিকহ ওয়াল আদব হযরতুল আল্লাম মাওলানা ই'যায আলী ছাহেব রহ. প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাহেরী ও বাতেনী ইলম অর্জনে সমৃদ্ধ হওয়ার পর হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. দেশে ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক নিজ পরিবার ও গ্রাম থেকে খিদমতের কার্যক্রম শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তিনি সিলেটের প্রাচীন ও বিখ্যাত ঝিঙ্গাবাড়ি আলিয়া মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এর কিছুদিন পর জামি'আ মিল্লিয়াতে মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন।

কিশোরগঞ্জে শুভাগমণ

কিশোরগঞ্জে বৌলাই নামক গ্রামে অসাধারণ দীনী চেতনা ও ধর্মীয় সংস্কৃতিমনা এক জমিদার বংশ ছিল। সেখানের এক জমিদার দীনদার ও কামিল বুযুর্গের সান্নিধ্যে থাকার ইচ্ছা করে হাকীমুল উম্মত রহ. এর কাছে নিবেদন করলে তিনি হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. কে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মাওলানা শিক্ষকতা ছেড়ে বৌলাই জমিদার বাড়িতে আসতে চাননি; তিনি এসেছিলেন মুর্শিদের আদেশ পালনার্থে। যেহেতু তিনি ছিলেন খুব স্বাধীনচেতা, তাই জমিদারদের সাহচার্য পছন্দ করতেন না। যদিও তারা একান্তভাবে দীনদার এবং আলেমদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতেন, তথাপি এ পরিবেশ ভালো না লাগায় তিনি হাকীমুল উম্মত রহ. এর কাছে মানসিক অবস্থা জানিয়ে ওযর পেশ করে মাতৃভূমিতে ফিরে নীরবে যিকির ও শোগল করার ইচ্ছা জানান। অনুমতি লাভ করে তিনি বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু আবারো তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে আসতে হল কিশোরগঞ্জে। ঘটনাক্রমে কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে ইমামের প্রয়োজন হলে এর জন্য তাকেই মনোনীত করা হয়। এরপর তিনি কিশোরগঞ্জে স্থায়ী হন।

তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধিতে আত্মনিয়োগ

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীস শাস্ত্রের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আত্মশুদ্ধির জন্য হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর দরবারে উপস্থিত হন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. তাকে খিলাফত প্রদান করেন। মাওলানা আতহার আলী রহ. হযরত থানবী রহ. এর প্রথম সারির মহান খলীফাগণের মধ্যে গণ্য হতেন। তার সম্পর্কে হযরত থানবী রহ. এর একটি মন্তব্য এমন– যখন মাওলানা তার অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখলেন– কিছুদিন হল অন্তরে আল্লাহর দিদার লাভ ও স্বপ্নযোগে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

হযরত থানবী রহ. নিয়মমাফিক চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখলেন, আলহামদুলিল্লাহ! অবস্থা শুনে খুব খুশি হলাম। দেখার জন্য মুরাকাবার অনুমতি দেয়া হল। এ থেকে অনুমান করা যায়, মাওলানার আধ্যাত্মিক উন্নতি কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

জীবনের শেষ দিকে তিনি মোমেনশাহী জামি'আ ইসলামিয়াতে অবস্থান করেছেন। এ সময় তিনি প্রতিদিন বাদ ফজর মসজিদে ছাত্র, শিক্ষক ও মুরীদানদের উদ্দেশ্যে এক ঘন্টা নসীহত করতেন। মজলিসের উপস্থিতিরা তার নসীহত দ্বারা মুর্দা দিল যিন্দা করার সুযোগ পেতেন।

রাজনৈতিক জীবন

কর্মজীবনের প্রথম দিকে মাওলানা আতহার আলী রহ. এর লক্ষ্য ছিল কেবল শিক্ষাদান এবং ইসলাহী খিদমত। কিন্তু সে সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। এ অবস্থায় উলামায়ে কেরামের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। মূলত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বছরগুলোতে (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) তিনি থানবী রহ. এর পরামর্শে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর অবিভক্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত সব আসনে নিরঙ্কুশ বিজয়

লাভ করে। এ বিজয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়ন এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যত ঐ পরিষদের ওপরই ন্যস্ত ছিল।

তারপর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ জনসম্মুখে দ্বিজাতি তত্ত্ব পেশ করে এবং এটা প্রমাণ করে যে, হিন্দুদের গোলামীর জন্য মুসলমানরা প্রস্তুত নয়। অবশেষে ইংরেজ, হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় পাকিস্তান দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় এবং ভারত বিভক্তির তারিখ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট নির্বাচন করা হয়।

সিলেটে গণভোট এবং মাওলানার কর্মতৎপরতা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলেও সিলেট ও সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, না কি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে এ নিয়ে ইংরেজ ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে একটি নতুন ইস্যু সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টির সিদ্ধান্তের ভার গণভোটের ওপরই ছেড়ে দেয়া হয়।

সিলেটের গণসংযোগে হযরত মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী ছাড়াও হযরত মাওলানা আতহার আলী এবং হযরত মাওলানা ছাহল উসমানী ছাহেবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে মাওলানা আতহার আলী রহ. এ গণসংযোগকে সফল করে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

আদর্শ প্রস্তাব এবং মাওলানার প্রস্তাবনা

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ৫ ও ৬ অক্টোবর জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কার্যনির্বাহী সভাপতি মাওলানা আতহার আলী রহ.-এর সভাপতিত্বে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কার্যকরী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মরহুম লিয়াকত আলী খান কর্তৃক অ্যাসেম্বলীতে পেশকৃত পাকিস্তানের সংবিধান বিষয়ক বি.পি.সি রিপোর্ট পর্যালোচনার ভিত্তিতে এক প্রস্তাব পাশ হয়।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ১৫, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর শর্ষিণার পীর হযরত মাওলানা নিসারুদ্দীন ছাহেবের সভাপতিত্বে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হিযবুল্লাহর যৌথ উদ্যোগে বরিশালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পাকিস্তানের সংবিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার পর ১২ দফা প্রস্তাব পাশ হয়। জমিয়তের পক্ষ থেকে সংবিধান এবং আইন বিষয়ক এটিই ছিল প্রথম প্রস্তাবনা।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান অ্যাসেম্বলীতে মৌলিক অধিকার ও সংবিধান কমিটির পক্ষ থেকে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে সংবিধানের একটি রূপরেখা পেশ করা হয়। যা ইসলাম ও গণবিরোধী বলে জনগণ প্রত্যাখান করে। এ সংবিধানের বিরুদ্ধে মাওলানা আতহার আলী রহ. এবং জমিয়তের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে সারাদেশে চরম আন্দোলন গড়ে ওঠে। জনগণের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর অসংখ্য টেলিগ্রাফ আসতে থাকে। এ প্রেক্ষিতেই কায়েদে মিল্লাত মরহুম লিয়াকত আলী খান অ্যাসেম্বলীতে এ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত ঘোষণা করেন এবং সংবিধানের পূর্ণ রূপরেখা পেশ করার জন্য জনগণের কাছে আহবান জানান।

এ আহবানের প্রেক্ষিতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী আল্লামা সুলাইমান নদভী রহ. এর সভাপতিত্বে সিলেটে জমিয়ত আয়োজিত কনফারেন্সের বিশেষ অধিবেশনে তা পর্যালোচনার জন্য পেশ করা হয়। গভীর পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনের ভিত্তিতে তা গৃহীত হয় এবং পরে অ্যাসেম্বলীতে পেশ করা হয়। আদর্শ প্রস্তাব বাস্তবায়নে মাওলানা আতহার আলী রহ. যে কী পরিমাণ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছিলেন উপরোল্লিখিত তথ্যাবলী তারই প্রমাণ বহন করে। তার এ সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ, ত্যাগ স্বীকার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলেই ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামী ভাবধারা সংযোজিত হয়।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের প্রাক্কালে নেযামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে প্রচারিত নির্বাচনী ইশতিহারে ইসলামী রাষ্ট্রের ২২ দফা মূলনীতি এবং এতে স্বাক্ষরকারী উলামাদের নাম ছিল। যে ২২ দফা মূলনীতি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.-এর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় উলামা কনভেনশন করাচীতে পাশ করা হয়। এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মাওলানা বার বার সারা দেশ সফর করে উলামাদেরকে সে সময়কার গুরুত্ব ও উদ্ভূত নাযুক পরিস্থিতি অবগত করেন এবং নানা মতাদর্শের কেন্দ্রীয় উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের ৩১ জনকে ঐক্যমতে আনতে সক্ষম হন। এর ফলে এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে মাওলানার পদক্ষেপ

স্বাধীনতার পরপরই ভারত সরকার যখন সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করে, মাওলানা আতহার আলী রহ. জমিয়তের পক্ষ থেকে এ অবস্থা নিরসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও পদক্ষেপ হাতে নেন। তার দু' একটি উদাহরণ পেশ করা হল-

১. ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যখন সে দেশের মুসলমানদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয় তখন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তের প্রচেষ্টায় ও আহ্বানে ইরানের উলামা সম্প্রদায় ভারত সরকারের কাছে মুসলিম হত্যা ও লুটতরাজের বিরুদ্ধে জোরালো ও কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানান এবং তা বন্ধের আহবান জানান। জমিয়তের পক্ষ থেকে ইরানের উলামা সম্প্রদায়কে মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতামূলক তারবার্তা প্রেরণ করা হয় (৩ মার্চ ১৯৫০)। মাওলানার এ সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ সবার কাছে প্রশংসনীয় ও কার্যকরী প্রমাণিত হয়।

নেযামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠা

ইসলামী আইন চালুর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের ব্যর্থতা যখন চরমে পৌঁছল তখন উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামী আইন চালু করার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. এর উদ্যোগে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জের হায়বত নগরে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তিন দিনব্যাপী এক কাউন্সিলে নেযামে ইসলাম পার্টির ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন হযরত মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী রহ.। এ কাউন্সিলেই শাসক দল মুসলিম লীগকে সর্বোতভাবে সমর্থন করার এ যাবতকালের নীতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়া হয়।

নেযামে ইসলাম পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

করাচীতে পশ্চিম পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠালগ্নে হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. এর পেশকৃত বক্তৃতায় এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়– পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশে ইসলামী আইন চালু করা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে গণমানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড চাঙ্গা করা।

মোটকথা, পাকিস্তানে ইসলামী নেযাম (আইন-কানুন) চালু করার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন বাস্তব ক্ষেত্রে এর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নেযামে ইসলামের আন্দোলন এবং মাওলানার ত্যাগ ও কুরবানী

মাওলানা আতহার আলী রহ. এ প্রত্যাশায় মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন কায়েম হবে। আল্লাহ তা'আলা সাধারণ মুসলমান ও উলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টাকে সফলতা দান করেন। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু পাকিস্তানে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টি করা হয়। তার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি) এবং তার পীরভাই ইসলামী ইতিহাসবিদ আল্লামা সুলাইমান নদবী রহ. যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন ততদিন তার আশা ছিল, কোন না কোন সময় পাকিস্তানে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল অন্যরকম। আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আর আল্লামা নদবী রহ. ২৪ নভেম্বর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার বাহ্যিক কোন আশা আর থাকল না। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে পশ্চিম পাকিস্তানে হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. এর পীরভাই হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এবং পূর্ব পাকিস্তানে হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ.-কে উলামা সম্প্রদায় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নেতা হিসেবে গ্রহণ করেন। এ দু' নেতা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পুরোমাত্রায় অব্যাহত রাখেন। হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. ইসলামী আন্দোলনকে সর্বব্যাপী করার লক্ষ্যে নেযামে ইসলাম নামে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে সারা পাকিস্তানে এত প্রবলভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেন যে, সারাদেশের সর্বস্তরের মানুষ এবং উলামায়ে কেরাম নব প্রতিষ্ঠিত এ নেযামে ইসলাম পার্টিকে স্বাগত জানান এবং তার নেতৃত্বকে বরণ করে নেন। তার বলিষ্ঠ ও যথাযোগ্য নেতৃত্বের কারণে আন্দোলন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং একটি শক্তিশালী ও মজবুত রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি এবং মাওলানার নেতৃত্ব

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং মাওলানার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন হলে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির একটি ধারা ছিল এমন– চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পার্টিসমূহ পাকিস্তানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান ও চাহিদা অনুযায়ী, যার ব্যাখ্যা ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সর্বদলীয় উলামা কনফারেন্সে করা হয়েছিল, সংবিধান প্রণয়ন করানোর চেষ্টা করাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে পূর্ণ তৎপরতার সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

যুক্তফ্রন্টের ফলাফল এবং নেযামে ইসলাম পার্টির উল্লেখযোগ্য সাফল্য

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলীর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের বিপরীতে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং যুক্তফ্রন্ট আশাতীত সফলতা অর্জন করে। নেযামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টের অবিচ্ছেদ্য ও শক্তিশালী দল হিসেবে এ নির্বাচনে অংশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে এবং জাতীয় অ্যাসেম্বলীতে ৪টি ও প্রাদেশিক ।সেম্বলীতে ৩৬টি আসন লাভ করে।

জাতীয় কল্যাণে নিবেদিত তার কিছু রাজনৈতিক কীর্তি

১. মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা।

২. বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) নায্য দাবির সংরক্ষণ।

৩. সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দুস্তান থেকে উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হয়ে হিজরতকারী অসংখ্য উদ্বাস্তুর সাহায্য সহযোগিতা ও পুনর্বাসন।

তার রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য

১. বিশুদ্ধ নিয়ত। ২. সঠিক কর্মপন্থা। ৩. সঠিক কৌশল অবলম্বন।

কোন আন্দোলনে সাফল্য অর্জনের এগুলো হল মূল ভিত্তি। এ তিনটি বিষয় তার নিজের বানানো নয়; এগুলো তার উস্তাদ আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা। এর কোন একটির অভাব হলে রাজনীতি কেন কোন কাজেই সাফল্য অর্জন সম্ভবপর নয়।

মাওলানার কারাজীবন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে স্বাধীন হলে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচারণায় তার বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানো হয়। যার পেক্ষিতে তাকে কারারুদ্ধ করে সরকার তার উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। নির্যাতনের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকবার তিনি মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছেও যান। এ বন্দিদশা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর তিনি মুক্তি পান।

শেষ জীবন : শেষ জীবনে তিনি মোমেনশাহীতে আগমন করেন। এ সময়ে তার হাতে মোমেনশাহীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মোমেনশাহীতেই ইলমে দীনের খিদমতে নিরত থাকেন।

মৃত্যু : ১০ শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ৬ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবারে এ মহামনীষী মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দিন।

লেখক: শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।
ইমাম ও খতীব, সিদ্দীক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

(সম্পাদকীয়; ২ নং পৃষ্ঠার পর)

প্রিয় পাঠক! গোটা বিশ্বকেই আপনি নিজ দেশের উপর অনুমান করুন। অন্ধকে ধরে বাঁধা আর ফকিরকে ধরে কাঁদার নীতি বর্জন করুন। চিলে কান নিয়েছে শোনে কানে হাত না দিয়েই চিলের পিছে দৌড়ানো বন্ধ করুন। তাহলেই কেবল আপনার ও আপনার সন্তানদের ঈমান রক্ষা পাবে। অন্যথায় মুনাফিক সেন্ট পল যেমন গোটা খ্রিস্টজগতকে কার্যত ইয়াহুদী বানিয়ে ছেড়েছে তেমনি এ অভিশপ্ত ও বিভ্রান্তরা যৌথ ষড়যন্ত্রে আপনার-আমার ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ঈমান কেড়ে নিবে। এখন আমরা টাই পরি, কিছুদিন পর হয়তো ক্রুশ ধারণ করা শুরু করবো। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

শোকরিয়া জ্ঞাপন ও দুআর আবেদন

আল্লাহ পাকের অশেষ ফযলে আপনার প্রিয় পত্রিকা 'রাবেতা' ত্রৈমাসিক হিসেবে একটি বছর পার করেছে। প্রতিটি সংখ্যায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আশার আলো দেখিয়েছেন। পাঠকদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। বহুবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এ বছর রাবেতা দ্বি-মাসিক হিসেবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাঠক ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের নিকট দু'আর আবেদন, আল্লাহ তা'আলা যেন 'রাবেতা'র সকল কর্মী, লেখক, পাঠক ও সহায়ককে আরো বেশি মকবুলিয়ত দান করেন। আ-মীন।

ইলমে দীনের খিদমতকারীগণ ও তাদের বেতন-ভাতা

মাওলানা মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান দেওদরগী (ইউ.পি. ইন্ডিয়া)

দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই, থামাথামির লক্ষণ নেই, থামাবারও কেউ নেই। পাল্লা দিয়ে পড়ে যাচ্ছে টাকা-পয়সার মান, চলতে গিয়ে বার বার খাচ্ছে হোঁচট। এদিকে ইলমে দীনের খাদিম, নায়েবে নবীদের বেতন-ভাতা রয়ে যাচ্ছে আগের মতই যৎসামান্য। একটা সময় ছিল, মানুষ সামান্য টাকা-পয়সাতেই জীবন 'যাপন' করে নিত। বর্তমানে মধ্যআয়ের মানুষের জন্যও জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাববার বিষয় হল, যেখানে দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি মধ্যবিত্ত গৃহকর্তাকেই চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে দিচ্ছে এবং রাত-দিন খাটা-খাটুনির পরও জীবনের চাহিদা পূরণের ব্যর্থতায় তারা হতাশ! সেখানে নিম্নআয়ের একজন ব্যক্তি কীভাবে নিজের ও পরিবারের জন্য দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে পারে? এমন দুর্দশার মধ্যেও উলামায়ে কেরাম স্বল্প বেতনে, সামান্য অযীফায় নিজেদেরকে দীনী খিদমতে নিয়োজিত রেখেছেন। সন্দেহ নেই, এটা তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন। কথা হল, তারা না হয় আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে নিজ নিজ কুরবানীর প্রতিদান পেয়ে যাবেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে সব দায়িত্বশীল তাদেরকে সর্বদা পেরেশানীতে রাখছেন তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে এর কী জওয়াব দিবেন! যা হোক, চড়ামূল্যের এ বাজারে ইলমে দীনের খাদিমগণের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করতে তাদের অযীফা অর্থাৎ বেতন-ভাতা কী মানের হবে, বেতন-ভাতা নির্ধারণের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত, বর্তমানের ভারসাম্যহীন ব্যবস্থাপনার কারণে তারা যে দুর্গতির শিকার হচ্ছেন তার আশু সমাধান কী, আকাবিরদের যুগে তাদের বেতন-ভাতা কী মানের ছিল– এ সকল বিষয়ে সংস্কারমূলক কিছু আলোচনা ও সুপারিশ পেশ করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সেগুলো বিবেচনার হিম্মত দেখাবেন।

আকাবিরদের যুগ

ফিকহে হানাফীর দৃষ্টিতে দীনী খিদমতের বিনিময় নেয়া জায়েয নয়। পূর্বসূরী ফুকাহায়ে আহনাফ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটা সে যুগের কথা যখন উলামায়ে কেরামের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বাইতুল মালের দায়িত্বে ছিল। তারপর যখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পরিসমাপ্তির সাথে বাইতুল মালের ব্যবস্থপনারও পরিসমাপ্তি ঘটলো তখন পরবর্তী হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম দীনী খিদমতের বিনিময়কে জায়েয বলেছেন। আর এখনো এ মাসআলার উপর আমল চলছে।

- হযরত আতা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনজন উস্তাদ মদীনা মুনাওয়ারায় শিশুদেরকে পড়ালেখা করাতেন। হযরত উমর রাযি. তাদের প্রত্যেককে মাসিক ১৫ দিরহাম ভাতা প্রদান করতেন। (তারীখে দিমাশ্‌ক ২৪/২৫ শামেলা সংস্করণ)
- আল্লামা নববী রহ. খতীবে বাগদাদীর বরাতে বেতনের পরিমাণও উল্লেখ করেছেন, 'মুসলমানদের শাসকদের জন্য অপরিহার্য হল, যে ব্যক্তি নিজেকে ফিকহ ও ফাতাওয়ার জন্য নিযুক্ত করবে তার জন্য এই পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করবে যা তাকে অন্যান্য পেশা বা কাজে নিয়োজিত হওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে। আর এর ব্যবস্থাপনা হবে বাইতুল মাল থেকে।' অতঃপর তিনি হযরত উমর রাযি. এর কর্মপন্থা বর্ণনা করেন যে, তিনি ফিকহ ও ফাতাওয়া কাজের যোগ্য ব্যক্তিকে বছরে একশত দীনার প্রদান করতেন। (মুকাদ্দামাতু রসমিল মুফতী; পৃষ্ঠা ১৫)
- ১৫ হিজরীতে যখন সকলের বার্ষিক ভাতা নির্ধারিত হল, তখন অন্যান্য আকাবিরে সাহাবার সাথে হযরত উমর রাযি. এরও বাৎসরিক পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করা হল। (আল ফারুক ২/২৯৮)
- হযরত উমর রাযি. এর নিকট সকল প্রজাদের নাম সংবলিত একটি টালি খাতা ছিল। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ইলমী যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুসারে ভাতা লিপিবদ্ধ ছিল। বদরী সাহাবীদের ভাতা ছিল সর্বাধিক। পরবর্তী স্তরের ভাতা পেতেন অপেক্ষাকৃত পরে ইসলাম গ্রহণকারীগণ। একবার হযরত উমর রাযি. আহলে বাইতের লোকদের ভাতা কিছুটা বৃদ্ধি করে দেন, তখন ছাহেবযাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আপত্তি করেন। (আল ফারুক)
- ফিকহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য কিতাব জামে সগীরে বর্ণিত আছে, কিতাবুল্লাহর বাহকদের বাইতুল মাল হতে বাৎসরিক দুইশত দীনার দেয়া হবে। (জামে সগীর ১/৩৩৬ মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ)
  আল্লামা মুনাবী রহ. এর ব্যাখ্যায় লিখেন, যদি এই পরিমাণ তাদের খরচের জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে তো ঠিক আছে। অন্যথায় আরো বৃদ্ধি করা হবে। (তাইসীরু শরহিল জামে সগীর ১/৯৯৯ শামেলা সংস্করণ)
- হযরত উমর রাযি. এর যুগে যখন দৈনন্দিন-ভাতার ব্যবস্থা ছিল, একদিনের খরচ হিসেবে প্রত্যেককে আধা বকরী করে দেয়া হত।

এ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু টুকরো কথা, যখন ইলমে দীনের খাদেমগণকে সর্ব উপায়ে উৎসাহ দেয়া হত এবং তাদের প্রতি এ পরিমাণ লক্ষ্য রাখা হত যে, তারা নিশ্চিন্তে একাগ্রচিত্তে নিজেদেরকে দীনী খিদমতে নিয়োজিত রাখতে পারতেন।

স্বল্প বেতন-ভাতার বিরূপ প্রভাব

খোঁজ করলে বিস্ময়কর যোগ্যতার অধিকারী এমন কিছু ব্যক্তিকেও পাওয়া যাবে, যারা একাগ্রতা ও পূর্ণ মনোযোগের সাথে ইলমী ময়দানে লেগে থাকতে পারলে কালজয়ী সব কীর্তি-কর্ম সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু বেতনের স্বল্পতা তাদেরকে এ পথ ছাড়তে বাধ্য করেছে। অবস্থাদৃষ্টে কিছু তালিবে ইলম তো শুরু থেকেই এ মানসিকতা বানিয়ে নেয় যে, শিক্ষা সমাপনীর পর ইলমী খিদমত ভিন্ন অন্য কোন পেশা অবলম্বন করতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকায় সফর করতে হবে। নতুবা মসজিদ-মাদরাসার এ স্বল্প বেতনে জীবন চালানো কীভাবে সম্ভব? অধিকন্তু ইলমী কাজের জন্য একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি জীবিকার চিন্তা-ভাবনা ও তার উপায় উদঘাটনেই ব্যস্ত থাকে, তার সকাল-সন্ধ্যা এই ভাবনাতেই ব্যয়িত হয় তখন সে ইলমী কাজের জন্য আর কখন নিজেকে ফারেগ করবে?

এ কারণেই আজ ইলম ও তাহকীকের ময়দানে যোগ্য লোকের আকাল চলছে।

যোগ্যতার এই অবমূল্যায়ন গবেষণামূলক কাজের জন্য ভয়ঙ্কর বিষরূপে কাজ করছে।

যদি মাদরাসা কর্তৃপক্ষগণ এ ব্যাপারে মনযোগী হয়ে আসাতিযা হযরতদের যথাযথ মূল্যায়ন করেন, তাদেরকে জীবিকার ভাবনা থেকে মুক্তি দিয়ে একাগ্রতার সাথে ইলমী খিদমতে লেগে থাকতে সহযোগিতা করেন, আর্থিক টানাপড়েন যেন তাদের নিত্যসঙ্গী না হয় সে ব্যাপারে সহমর্মী হন, তাদেরকে জ্ঞান-গবেষণা ও রচনামূলক কাজে কার্যকর পন্থায় উৎসাহিত করেন তা হলে আশা করা যায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

তা'লীম ও তাদরীসের অধঃপতনের একটি মূল কারণ হল, উস্তাদদের বেতন-স্বল্পতা। প্রতিটি মাদরাসার দায়িত্বশীলদেরই এ আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, তাদের প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান উন্নত হোক, তাদের মাদরাসা গোটা এলাকার আদর্শ মাদরাসা হোক, সকল তালিবে ইলম তাদের মাদরাসা অভিমুখী হোক, সর্বত্র তাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক। এ ভাবনাগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও কাম্য। কিন্তু এগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মেহনত কি করা হয়? আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পদক্ষেপ কি গ্রহণ করা হয়? হয় না। ফলে আসাতিযা হযরত ছাত্রদের উপর তেমন মেহনত চাইলেও করতে পারেন না। দায়িত্বের খাতিরে সংক্ষেপে দু' একটি উর্দূ (বা বাংলা) নোট দেখে কোন রকম দরস চালিয়ে যান। পরিশেষে ছাত্ররা অপরিপক্ক যোগ্যতা ও সমপরিমাণ দক্ষতা নিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করছে। এরাই আবার সাধারণ লোকদের ইমাম হচ্ছে। তাদের নিকট দীন পৌঁছাচ্ছে। এতে লাভের তুলনায় ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে।

বেতনের মান ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়ার লেখকের দৃষ্টিতে

হযরত মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ. নিকট-অতীতের অতুলনীয় একজন ফাতাওয়া বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যার ফাতাওয়া উলামায়ে কেরাম ও সর্বসাধারণ সকলের নিকট জনপ্রিয়। তিনি তার ফাতাওয়ার কয়েক স্থানে ইলমে দীনের খাদিমগণের বেতন-ভাতা নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। বেতনের মান ও অবস্থান নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি নিজেও স্বল্প বেতনে দীনী খিদমত করে গেছেন। তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

- খাদিমানে মাসাজিদ ও মাদারিসদের ইলমী যোগ্যতা এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে মাসিক বেতন নির্ধারণ করা উচিত। মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত ওয়াকফের আমদানী হতে যদি সম্ভব হয় তাহলে তা হতে নতুবা মুসলমানদের থেকে চাঁদা উঠিয়ে তার প্রয়োজন অনুযায়ী মাসিক বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা উচিত।
- অন্যত্র লিখেন, যখন মসজিদের আয় যথেষ্ট ভালো এবং ইমাম ছাহেব ও খতীব ছাহেব দীর্ঘদিন খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, জুমুআর দিন বয়ানও করেন, নেক ও মুত্তাকীও বটে। এদিকে তার পরিবার-পরিজনও রয়েছে। তাহলে মসজিদ কমিটির জন্য আবশ্যক হল, বর্তমান বাজার দরের প্রতি খেয়াল রেখে তাদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেয়া। মসজিদের আয় (সাপ্তাহিক চাঁদা ও সাধারণ দান ইত্যাদি) ভালো থাকা সত্ত্বেও ইমাম-খতীবদের পারিবারিক খরচ অনুযায়ী বেতন না দেয়া যুলুম। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/১৫৩ জাদীদ)
- অন্য এক স্থানে মসজিদ-মাদরাসার যিম্মাদারগণের (কমিটি, মুহতামিম ইত্যাদি) প্রতি সতর্কবাণী হিসেবে বলেন, পারিশ্রমিক পূর্ণ না দেয়ার অর্থ শুধু এটাই নয় যে, তার পারিশ্রমিক একেবারেই না দেয়া বা পূর্ণ; বরং এটাও পারিশ্রমিক না দেয়ার অন্তর্ভুক্ত যে, এ কাজের জন্য যতটুকু পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত ছিল ততটুকু না দেয়া এবং শ্রমিকের অপারগতা থেকে গলদ ফায়দা উঠানো যে, যত কম পারিশ্রমিকে পারা যায় তার থেকে কাজ নেয়া। ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন,

ويعطى بقدر الحاجة والفقه والفضل فان قصر كان الله عليه حسيبا.

অর্থ : মুতাওয়াল্লী এবং মাদরাসার কমিটি বা মুহতামিমের জন্য আবশ্যক যে, মসজিদ ও মাদরাসার খিদমত-কারিদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে এবং তাদের ইলমী যোগ্যতা, তাকওয়া ও পরহেযগারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে মাসিক বেতন-ভাতা এবং বোনাস দিতে থাকবে। অবকাশ ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেতন-ভাতা ও বোনাস কম দেয়া জঘন্য কাজ এবং এ জন্য কমিটির লোক ও মুহতামিমদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/১৩৮ জাদীদ)

হযরত মুফতী ছাহেব রহ. অত্যন্ত জোরালোভাবে কমিটি ও মুহতামিমগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়েছেন, যাতে তারা মাদরাসার উস্তাদ ও মসজিদের ইমাম-মুআযযিন ও খাদিমগণকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে বেতন দেন। তাতে কোন ধরণের কম করা যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। আর যারা কম দিতে চান তাদেরকে এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জবাবদিহিতার ভয় করা উচিত। বরং এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে ফিকহে হানাফী জগতের অন্যতম আলেমে দীন মুফতী আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. বলেন,

- যারা উম্মতের সেবায় নিয়োজিত যেমন, মুসলিম বিচারক, মুফতী, মুদাররিস (অনুরূপ ইমাম, মুয়াযযিন, খাদিম ইত্যাদি) তাদেরকে পূর্ণ বছরে এই পরিমাণ ভাতা দেয়া উচিত যাতে শুধু যেন তাদের প্রয়োজনই পূরণ না হয়; বরং এই বেতনে সন্তুষ্ট হয়ে তারা যেন দীনী কাজে অটল থাকে এবং দীনের কাজ যেন তারা অক্লান্ত সাধনা ও পূর্ণ পরিশ্রম করে আঞ্জাম দিতে পারেন। (আদ্দুররুল মুখতার ৭/২১৯)

যিম্মাদারগণের স্বচ্ছল জীবন

এ কথা শতভাগ সত্য ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে, আমাদের আকাবির হযরতগণ কখনো দীনী খিদমতের জন্য বেতনের প্রত্যাশী ছিলেন না। বরং কিছু এমন ঘটনাও রয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ কখনো বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন আর আসাতিযায়ে কেরাম তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু এগুলো সে যুগের কথা, যখন মানুষের প্রয়োজনের তালিকা এত দীর্ঘ হতো না। আর জিনিসপত্রের মূল্যও এমন আকাশচুম্বী ছিল না। সে যুগে উস্তাদগণ ও কর্তৃপক্ষের জীবনধারায় চোখে পড়ার মত তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হত না। আকাবিরদের যুগে সকলের জীবনধারা একই রকম ছিল। মুদাররিস ও মুহতামিম উভয়ে সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতেন।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. একদিকে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী মারকাযের মুহতামিম। অপরদিকে সাদাসিধা জীবনে অতুলনীয়। হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. একদিকে মাদরাসার মুহতামিম অপরদিকে ক্ষুধার যাতনায় বেহুশ হয়ে যাচ্ছেন। এই ছিল মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অবস্থা। ঘরে চুলা জ্বলত না। যদি আজও

এমন অবস্থা হয় যে, কর্তৃপক্ষও ক্ষুধার যাতনায় অস্থির তো এমন পরিস্থিতিতে আসাতিযা হযরতগণও অবশ্যই ক্ষুধা বরণ করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু এখানে বিষয়টা সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি আজ মাদরাসা কর্তৃপক্ষের খরচের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তো দেখা যাবে নিত্যনতুন পোশাক, হরেক রকমের জুতো, সর্বদা টাকায় টাকায় পকেট ভরপুর। রঙ্গীন রঙ্গীন নতুন মডেলের মোবাইলে হাত সজ্জিত। যেন তাদের জীবনটাই স্বচ্ছলতা বা প্রাচুর্যের অপর নাম। আমরা এ কথা একটুও অস্বীকার করি না যে, আপনি জীবনের শুরুলগ্নে অনেক কষ্ট-ক্লেশ করেছেন। অভাব-অনটনে আপনার জীবন দুঃসহ হয়ে পড়েছিল। অনেক যাতনা ও বেদনা বুকে বহন করে আজ এ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তাই বলে কি আজ সেই পেরেশানীর ভারী পাথর ইচ্ছে করেই অন্যের বুকে চাপাতে চাইছেন? কিন্তু কেন?

আজ এ বিষয়টা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মসজিদ-মাদরাসার কর্তৃপক্ষগণ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হবেন। বিবেকের দরজায় টোকা দিয়ে প্রকৃত অবস্থা জানবেন ও বেতন-ভাতার ব্যাপারে নিজেদের দৃষ্টি বদলে ফেলবেন এবং এ ব্যাপারে উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বেতন-ভাতার মধ্যে সমতা ও ইনসাফ ফিরিয়ে আনবেন। আর তারা একমাত্র আল্লাহর জন্য দীনী খিদমতকে সামনে রেখে এমন একটা পরিমাণ নির্ধারণ করবেন যে, তার দ্বারা একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সহজেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে ইলমে দীনের খিদমতকারীগণের জীবন চাকা সচল করতে সহযোগিতা করবেন ও জান-প্রাণ উজাড় করে তারা যেন দীনের খিদমত করতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন। এতটুকু বেতন বাড়াবেন যাতে তারা নিশ্চিন্তে ও নিমগ্নতার সাথে দীনের খিদমত করতে পারেন। যা দীনের সকল খিদমতের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

মূল: উস্তাদ, দারুল উলূম হায়দারাবাদ, ইউ.পি. ইন্ডিয়া।

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কাসেমী
মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

(সীরাতুন্নবী ... ১৫ নং পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু কখনো কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাফা পর্বতের সেই দিনটি উদযাপন কর, হিজরতের দিনটি উদযাপন কর? তেমনিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ও মৃত্যুর দিনও এসব দিনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এসবের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কোন আমল বা বিধান পাওয়া যায় না। ইসলাম তো জাহেলী যুগের সব প্রথা ও কুসংস্কার মূলোৎপাটনের জন্যই এসেছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন অবশ্যই পবিত্র ও বরকতময়। কিন্তু যেহেতু এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন হুকুম নেই এবং সাহাবায়ে কেরামদের থেকেও কোন প্রকার আমল প্রমাণিত নেই, তাই মনগড়া এসব আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের সামনে প্রতি বছর এ দিনটির আগমন সত্ত্বেও কারও থেকে এ ধরনের দিবস উদযাপনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দিবস উদযাপন করা ইসলাম বহির্ভূত কাজ।

এরপরও আমরা সুন্নী ও নবীর আশেক! তাহলে নবী কোন পথে আর আমরা কোন পথে? তাই কবি-কণ্ঠ এখানে প্রতিবাদদীপ্ত হয়েছে,

تو کجا وسیب احمد کجا # با محمد کے بود نسبت را

অর্থ : তুমি কোন পথে আর নবী কোন পথে। এভাবে ভিন্ন পথে চললে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কখনোই তোমার সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে না।

সহীহ মুসলিমের হাদীস অনুযায়ী মীলাদুন্নবী উপলক্ষে নবী আলাইহিস সালামের আমল আর ঈদে মীলাদুন্নবীর আমল কি এক হল? বিখ্যাত নাতে রাসূল 'বালাগাল উলা'-এর রচয়িতা কবি শেখ সাদী বলেন,

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید # کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

নবীর পথ ছেড়ে যারা ভিন্ন পথে চলবে, তারা জাহান্নামে ছাড়া কোথাও যাবে না। নবী আলাইহিস সালামের বিপরীত কাজ করেও আমাদের উপাধি আশেকে রাসূল! এমন আজব আশেকে রাসূল কোথায় পাওয়া যায়! **(সংক্ষেপিত)**

(ভাষণটি ২৯ শে মে ২০১৪ কুমিল্লা জেলা কওমী মাদরাসা সংগঠনের উদ্যোগে ঐতিহাসিক কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে আয়োজিত সীরাতুন্নবী সা. মাহফিলে প্রদত্ত এবং মুফতী শামসুল হক জিলানী দা.বা. কর্তৃক সংকলিত।)

(সালাতুর রাসূল ... ৩৩ পৃষ্ঠার পর)

যেহেতু উক্ত দু'টি বিষয়ে পুরুষদের বিপরীতে মহিলাদের জন্য (সতরের দিকে লক্ষ্য রেখে) ভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই এ মূলনীতির ভিত্তিতে মহিলাদের নামাযের অবশিষ্ট আমলগুলোতেও এ বিষয়ে (সতর) লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এতগুলো বর্ণনা থাকার পরও যারা পুরুষ মহিলার নামাযে পদ্ধতিগত ভিন্নতা মানতে নারাজ, তারা হাদীসের কতটুকু অনুসারী তা পাঠকই বিবেচনা করুন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরও যদি হাদীসের উপর আমলের দাবিদাররা পুরুষ-মহিলাদের মাঝে নামাযের পদ্ধতিগত ভিন্নতা মানতে নারাজ হন, তাহলে তাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন থাকবে।

ক. পুরুষদের মত মহিলারাও যদি ভিন্ন মসজিদ বানাতে চায় তাহলে সমতা রক্ষার্থে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে কি?

খ. মহিলাদের আযান দেয়া, ইকামত বলা, খুতবা দেয়ার অনুমোদন থাকবে কি?

গ. মহিলার ইমামতিতে পুরুষদের ইক্তিদার বৈধতা দেয়া হবে কি?

ঘ. মহিলারা পিছনের কাতারে না দাঁড়িয়ে সমতা রক্ষার্থে পুরুষদের সাথে একত্রে দাঁড়ানোর অনুমতি পাবে কি?

বাস্তব কথা হল, আহলে হাদীস ভাইদের নিকটও নামাযের এ সমস্ত মাসআলায় পুরুষ-মহিলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তাহলে তারা কীভাবে পুরুষ-মহিলার নামাযে পদ্ধতিগত পার্থক্য না থাকার দাবি করে?

প্রিয় পাঠক! কেবল উদাহরণ হিসেবে এ কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হল। বস্তুত এ জাতীয় অসঙ্গতি ও ইলমী খিয়ানত দ্বারা ড. গালিব সাহেবের পুস্তকটি পরিপূর্ণ। কাজেই মজবুত আলেম না হলে এ জাতীয় বই পড়ে বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। নামায সংক্রান্ত হাদীস জানার আগ্রহে কেউ কোন বই পড়তে চাইলে কোন বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শক্রমে বই সংগ্রহ করে পড়ুন, ইনশাআল্লাহ গোমরাহী থেকে রক্ষা পাবেন। এ সংক্রান্ত কিছু নির্ভরযোগ্য বইয়ের তালিকা রাবেতার গত সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর '১৪) এ কলামে উল্লেখ করা হয়েছে।

লেখক: শিক্ষার্থী, ইফতা প্রথম বর্ষ; জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

অসৎ আলেম ও পীর

মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ

সূরা আরাফের শেষ ভাগে আল্লাহ পাক উল্লেখ করিয়াছেন যে, সৃষ্টির আদিতেই সমস্ত মানবজাতিকে তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, শিরক আর মূর্তিপূজা শুধু মূর্তি বানাইয়া পূজা করার নাম নয়। আল্লাহ তাহার নবীর মাধ্যমে যে শরীয়ত দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন, নবীর সেই শরীয়তের বিরুদ্ধে রাজপক্ষ অবলম্বন করাও একপ্রকার শিরক এবং মূর্তিপূজা। এই ধরণের মূর্তিপূজা এবং শিরকের সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি যে সৃষ্টির আদিতেই অঙ্গীকার নিয়াছেন যে, ঐ ধরণের শিরকও তোমরা করতে পারবা না, করলে জাহান্নমের মহাগ্নিতে শাস্তি ভোগ করিতে থাকবে, একথাও তিনি উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও যখন 'বলআম বাউরা' আলেম হওয়া সত্ত্বেও, আবেদ হওয়া সত্ত্বেও প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া, লোভের বশীভূত হইয়া নবীর শরীয়ত বাদ দিয়া টাকার লোভে স্ত্রীর মাধ্যমে প্রবঞ্চনায় গোমরাহ হইয়াছে, তখন আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন– তাদের আমি চক্ষু দিয়াছি, কান দিয়াছি, জ্ঞান ও বিবেক দিয়াছি তা সত্ত্বেও তার দ্বারা কাজ নিতেছে না, যারা এরূপ করবে, যারা আমার দেওয়া স্বাধীন ক্ষমতা, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার করবে তারা যেন জাহান্নামের কাষ্ঠ হইবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ বুঝা যায়।

নজির স্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি– এই ঘটনা থেকে সকলের সতর্ক হয়ে চলা দরকার, লোভের বশীভূত হইয়া, টাকার দাস হইয়া, স্ত্রীর কুমন্ত্রণায় বা অন্য কারো প্ররোচনায় কখনো কিছুতেই নবীর শরীয়তের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া লোভের বশীভূত হইয়া বা ভীত হইয়া রাজপক্ষ অবলম্বন করা চাই না। ঘটনাটি আল্লাহ তাআলা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তার কিছু বিস্তারিত বর্ণনা তাফসীর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। আল্লাহ তাআলা এ কথা পরিষ্কার বলে দিয়াছেন যে, আল্লাহর নাম, আল্লাহর গুণাবলী, আল্লাহর কাম, আল্লাহর ধর্ম সর্বৈব ভাল। একদল লোক দুনিয়াতে এমন আছে, যারা আল্লাহর আদেশ অনুসারে আল্লাহর ধর্মকে, আল্লাহর নামকে অ-জায়গায়, স্বার্থের জায়গায়, লোভের জায়গায় ব্যবহার করে না বরং তারা সত্য হেদায়াত করে এবং সত্য অনুসারে সুবিচার করে। পক্ষান্তরে আর একদল লোক আছে যাদের সৃষ্টিই যেন করা হইয়াছে জাহান্নামের কাষ্ঠ হওয়ার জন্য। তারা স্বার্থের জায়গায়, লোভের জায়গায়, অ-জায়গায়, কু-জায়গায় আল্লাহর ধর্মকে ব্যবহার করে। হে আমার নবী এবং নবীর শরীয়তের তাবেদারগণ! তাদের শাস্তি স্বয়ং আল্লাহই দিবেন, আপনারা তাদের পরোয়া করবেন না বা তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন না। আপনারা হক কথাই বলিয়া যাইবেন, হকের উপরই দৃঢ় থাকবেন, হক ইনসাফই করতে থাকবেন।

অর্থলোভী, স্বার্থপর, সরকার-ঘেষা আলেম ও পীরের নজিরের সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা আল্লাহ অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

আল্লাহ বলিয়াছেন– হে আমার নবী! আপনি পরবর্তী সমস্ত যুগের, সমস্ত মানুষের চিন্তার খোরাকের জন্য নজীর স্বরূপ ঘটনা বর্ণনা করুন, বুঝাইয়া দেন যে, মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত বড়ই আলেম, যত বড়ই আবেদ ও পীর হউক না কেন, যদি সে নিজে চেষ্টা ও ইচ্ছা করে তার লোভ ইত্যাদি রিপুকে দমন না করে টাকার লোভী বা স্বার্থপর, সরকার-ঘেষা হইয়া যায়, তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে। দুনিয়াতেও সে সৎ ও শিষ্টদের কাছে কুত্তার মত দুর! দুর! ছেই! ছেই! ইত্যাদি ঘৃণিত শব্দ ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে এবং আখেরাতের ভীষণ আযাব তো আছেই। মানুষের এই ধরণের লোভ ইত্যাদি রিপু আজ নতুন পয়দা হয় নাই। সৃষ্টির আদি থেকেই রিপুর সঙ্গে জিহাদ করিয়া জয়লাভ করিয়া সত্যিকার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা লোভ ইত্যাদি রিপু মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্কও করিয়া দিয়াছেন যে, খবরদার! রিপুর বশ, রিপুর দাস হইও না বরং সদা রিপুকে দমন করিয়া রাখিও।

বলআম বাউরার ঘটনাঃ সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জামানার ঘটনাটি এই– বলআম বাউরা নামে অতি বড় একজন আলেম ছিলেন। তিনি এত বড় আবেদ ও এত বড় পীর ছিলেন যে, তিনি যা কিছুই দুআ করতেন, তাই আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া যাইত। একবারকার ঘটনা এই হইল যে, হযরত মুসার শরীয়তের হুকুমের সঙ্গে এবং তৎকালীন বাদশার সঙ্গে মুকাবেলা হইল। বাদশার পক্ষের লোকেরা বহু টাকা তার স্ত্রীকে দিয়া বলআম বাউরাকে রাজার পক্ষ হইয়া হযরত মুসার শরীয়তের বিরুদ্ধে যাইতে তাহাকে প্রস্তুত করল। প্রথমতঃ তার গৌরব ছিল যে, সে যা দুআ করবে, তাই কবুল হইবে। কাজেই সে প্রস্তুত হইয়া গেল। পাহাড়ে নির্জনে গিয়া হযরত মুসা যাতে পরাস্তও পর্যুদস্ত হন, রাজা যাতে জয়ী হয়– সেইরূপ দুআ করার জন্য কিন্তু দুআ করিবার সময় তাহার জবান উল্টিয়া গেল। হযরত মুসার জয়ের এবং রাজার পরাজয়ের দুআ তার মুখ দিয়া বাহির হইল। তারপর যেহেতু এক পাপে আর এক পাপকে ডাকিয়া আনে, সে রাজাকে কুমন্ত্রণা দিল যে, এখন মুসাকে পর্যুদস্ত করার এক উপায় আছে।

সে উপায় এই যে, তোমরা ষোড়শী সুন্দরী যুবতী নারীদের মুসার লস্করের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ফেরী-দোকানদারী করার জন্য পাঠাইয়া দাও! মুসার লস্করের মধ্যে সব যুবকের দল। স্ত্রী ছাড়া তারা অনেক দিন আছে। যৌন ক্ষুধা তাদের প্রবল হইয়া আছে। পুরা লস্করের মধ্যে যদি একটি লোকেও একটি সুন্দরী নারীর সাথে যিনা করে অর্থাৎ তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তার সতীত্ব নষ্ট করে, তবে মুসার লস্কর থেকে আল্লাহর মদদ হটিয়া যাইবে, হয়ত আল্লাহর গযবও নাযিল হইতে পারে, ফলে তোমরা জয়ী হইয়া যাইবে। এই কুমন্ত্রণা অনুসারে কাজ হইল। হযরত মুসার লস্করের মধ্য হইতে একজন লোক যখন যিনা করিল তখন আল্লাহর গযব নাযিল হইয়া ৭০ হাজার সৈন্য প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলল। তারপর হযরত মুসার প্রধান সেনাপতি খবর পাইয়া ঐ যিনাকারী এবং যিনাকারিনী উভয়কে বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করিয়া আসমানের দিকে উঠাইয়া ধরিয়া আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিল যে, 'আমরা ব্যভিচারীকে এই ভাবেই শাস্তি দিব!'

প্রার্থনার পর প্লেগ রোগ কমিয়া যায়। ওদিকে বলআম বাউরার জিহ্বা কুত্তার মতো ঝুলিয়া যায় এবং লোকেরা তাহাকে কুত্তার মতো দুর! দুর! ছেই! ছেই করতে থাকে।

সরকার ঘেষা, অর্থলোভী, স্বার্থপর আলেম ও পীরের এটাই আসল শাস্তি। দুনিয়া আল্লাহর শেষ বিচারের স্থান নয়, সে জন্য এক জায়গায় তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, বাকী সবাইকে চিন্তা করিয়া ঐরূপ মহাপাপ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

আমার উদ্দেশ্য– ভাইদেরে, সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে সতর্ক করা, সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যারা সমাজে সত্যের বিরুদ্ধে, শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজ করে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতেছে বিশৃঙ্খলার জন্য তারাই দায়ী। আমি হক কথা না বললে আল্লাহর কাছে দায়ী হইব। শুধু সেই জন্য হক কথা সব ভাইকে জানাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি।

এত বড় আলেমটা, এত বড় আবেদ-পীরটা কেমন করে বিগড়ে গেল? আল্লাহ তার সংক্ষিপ্ত আয়াতের ভিতর তাও বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন, লোভ-রিপু বিড়ালের মধ্যেও আছে, অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যেও আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে দুইটি জিনিস বেশী আছে। তার মধ্যে বিবেক আছে, বিবেকের দ্বারা সে ভাল-মন্দ,ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে পারে। লোভের বশীভূত হইয়া রাজপক্ষ অবলম্বন না করিয়া নবীর শরীয়তের পক্ষই যে তার অবলম্বন করা উচিৎ ছিল, এ জ্ঞান মানুষকে দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়াও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখার সংযম শক্তিও মানুষকে দেওয়া হইয়াছে। বিড়াল-কুকুরকে এই শক্তি দেওয়া হয় নাই।

আল্লাহ বলিয়াছেন– বলআম বাউরার প্রথমতঃ বিবেকের ভিতরে ইচ্ছা শক্তি এবং সংযম শক্তি ছিল, সেই শক্তির দ্বারা আমি তাকে আমার কিতাবের ইলম দিয়াছিলাম, তার সেই ইলমকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকা উচিৎ ছিল, তা সে করে নাই বরং সে ইচ্ছা করিয়াই আমার কিতাবের ইলমের থেকে সরিয়া গিয়াছে, কিতাবের ইলমকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, তখনই শয়তান আসিয়া তার পেছনে লহিয়াছে, তারপর শয়তানের কুমন্ত্রণায় সে একেবারে গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। তারপর আল্লাহ বলিতেছেন, কোটি কোটি টাকার তুলনায়ও আমার কিতাবের ইলমকে তার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সে তা করে নাই। সে সামান্য লোভ-রিপুর বশবর্তী হইয়া দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া গিয়াছে, অথচ সে যদি লোভ-রিপুকে দমন করিয়া, টাকারা লোভকে পরিত্যাগ করিয়া আমার কিতাবের ইলমকে উর্ধ্বে স্থান দিত, তবে আমিও তাকে আমার কিতাবের ইলমের বরকতে অনেক উর্ধ্বে স্থান দান করিতাম, তার মর্যাদাও অনেক বাড়াইয়া দিতাম। কিন্তু সে যেমন আমার কিতাবের ইলমকে দূরে, নিচে ফেলিয়া দিয়াছে, আমিও তাকে অপমানিত কুত্তার মত করিয়া দিয়াছি।

দেখা গেল মানুষ ইচ্ছা করিয়াই নিজে আগে খারাবীর দিকে যায়, তারপর শয়তান আসিয়া ধরে এবং শয়তান ক্রমান্বয়ে কুমন্ত্রণা দিয়া অধিক গোমরাহীর দিকে লইয়া যাইতে থাকে। এটাও বুঝা গেল যে, আল্লাহর কিতাবের ইলমকে যাহারা ইজ্জত দিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে ইজ্জত দিবেন। পক্ষান্তরে যে সব লোক আলেম হওয়া সত্ত্বেও বা আলেম না হইয়া আল্লাহর কিতাবের ইলমের ইজ্জত না দিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভীষণ জিল্লতি এবং অপমান দান করবেন। এই আয়াতের বিশেষ উপদেশ এই যে, আলেমের কখনো অর্থলোভী, সরকার-ঘেষা হওয়া চাই না। নতুবা তাহার পরিণাম অতি ভয়াবহ।

আদি ইবনে হাতেম নতুন মুসলমান হইয়া যখন আমাদের হযরতের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিয়াছেন, হযরত তাহাকে ক্রুশকাষ্ঠ পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন এবং এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. [التوبة : ٣١]

আয়াতের তরজমা এই– তারা অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত খ্রিস্টানরা হযরত ঈসার (আ.) সত্য ধর্মকে ছাড়িয়া তাহাদের রাজা-বাদশাহদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণরা তাহাদের আলেমদের এবং পীরদেরে খোদা বানাইয়া নিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের আলেমরা এবং পীরেরা লোভের বশীভূত হইয়া রাজা-বাদশাহদের কাছে আসিয়াছে। রাজা-বাদশাহরা তাহাদের মত-মতো হারামকে হালাল করার, হালালকে হারাম করার ফতওয়া চাহিয়াছে, তাহারা তদ্রূপই করিয়াছে। অতএব তাহারা আল্লাহর দীন নবীর শরীয়তকে ছাড়িয়া পীরদের এবং আলেমদের প্রকৃত সত্য ধর্মকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সত্যকে তাহারা মিথ্যা বানাইয়াছে।

আদি রা. প্রশ্ন করিয়াছেন যে, আমরা তো আমাদের পাদ্রী-পোপদেরে খোদাও বানাই নাই, পূজাও করি নাই। হযরত বুঝাইয়া দিয়াছেন, খোদার হারামকৃত জিনিসগুলিকে তোমরা তোমাদের পাদ্রী-পোপদের মিথ্যা ফতওয়া অনুসারে হালাল করিয়া লইয়াছ। মিথ্যাকে সত্য করিয়া লইয়াছ। যেমন হযরত ঈসার (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অথচ তোমরা এই মিথ্যাকে তোমাদের পাদ্রীদের ফতওয়া অনুসারে এমন সত্য বানাইয়া লইয়াছ যে, এইটা তোমাদের ধর্মের প্রধান প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এইটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এইরূপে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সৃষ্ট দাস এবং প্রেরিত নবী কিন্তু তোমরা তোমাদের সেন্ট পাদ্রীর মিথ্যা ফতওয়া অনুসারে জ্ঞান-বিবেক-শরীয়ত সব বাদ দিয়া এই মিথ্যাকে সত্য মনে করিতেছ।

হযরত মূসার (আ.) তাওরাত কিতাবের শরীয়ত এবং ইঞ্জিল কিতাবের শরীয়তই হযরত ঈসার (আ.) শরীয়ত ছিল এবং মুক্তির পথ ছিল কিন্তু তোমরা তোমাদের পাদ্রী সেন্টপলের মিথ্যা প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া সব শরীয়তকে বাদ দিয়াছ; মিথ্যা শূলীকে, মিথ্যা পুত্রবাদকেই মুক্তির পথ মনে করিয়াছ, অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শূকর, সুদ, নারীর সতীত্ব হরণ তোমাদের শরীয়তে হারাম ছিল কিন্তু তোমাদের পাদ্রীরা রাজা-বাদশাহদের মত-মতো ফতওয়া দিয়া এই জঘন্য হারামগুলিকেও হালাল করিয়াছে।

আল্লাহ যে বলিয়াছেন, রাজা-বাদশাহদের এত মোহ, এত ভীতি থাকা সত্ত্বেও একদল লোক, একদল আলেম হকের উপর টিকিয়া থাকিবে, এর নযীর পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম হক মাসআলা বাতাইয়াছিলেন যে, তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে ঘরে রাখা হারাম এবং স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ করা হারাম কিন্তু এই হক মাসআলা তৎকালীন রাজার মতের বিরুদ্ধে হওয়াতে রাজা হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে কতল করিয়া ফেলে। আল্লাহর তরফ হইতে আযাব ও গযব আসিয়া রাজা মাটির তলে ধ্বসিয়া ধ্বংস হইয়া যায় এবং শত্রুরা আসিয়া ৭০ হাজার লোককে কতল করিয়া দেশ দখল করিয়া নেয়।

আমাদের হযরতের উম্মতের মধ্যে যেহেতু আর নবী হইবে না, সেজন্য উম্মতের যিম্মায়ই আমর বিল মা'রূফ ও

নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। খোলাফায়ে রাশেদীনগণের দ্বারা একসঙ্গে রাজত্বের খেদমতও হইয়াছে, ইসলামের খেদমতও হইয়াছে। অন্যান্য বাদশাহরা ভোগ-বিলাসে মত্ত রহিয়াছে। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু কোন কোন মুসলমান বাদশাহ এমন হইয়াছে যে, হক মাসআলা বাতানোর কারণে হক্কানী আলেমদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে কিন্তু হক্কানী আলেমগণ হক শরীয়তের হক কথা বাতান হইতে বিরত থাকেন নাই।

আমাদের ইমাম আযম, ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনজন বাদশাহর যামানা পাইয়াছেন। বাদশাহগণ তাহাকে চীফ জাস্টিসের পদ অফার (পেশ) করিয়াছে কিন্তু যেহেতু বাদশাহরা নিজেদের স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল– সেজন্য ইমাম সাহেব জেলের কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। কোড়া মারিয়া তার পবিত্র পৃষ্ঠদেশকে ক্ষত-বিক্ষত করা হইয়াছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত জেলের মধ্যে তাহাকে বিষ পান করাইয়া হত্যা করিয়া ফেলা হইয়াছে। তবু বাতিল হুকুমতের চীফ জাস্টিসের পদ গ্রহণ করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন যে, ঐসব বাদশাহদের মতের বিরুদ্ধে বিচার করার মত স্বাধীনতা তাহাকে তাহারা দিবে না।

মনসূর বাদশাহ ইমাম মালেককে হাদীস বর্ণনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইমাম মালেক রহ. হাদীস থেকে বিরত থাকেন নাই, সেজন্য বাদশাহর তরফ হইতে তাহাকে কোড়া মারা হইয়াছে। তা সত্ত্বেও তিনি সত্য হাদীস বর্ণনা হইতে বিরত থাকেন নাই। কেননা অন্য হাদীসে আছে, সত্য হাদীসের ইলম জানা থাকলে প্রশ্নের উত্তর না দিলে তাকে সত্য গোপন করার কারণে আগুনের লাগাম পরানো হইবে। ইমাম মালেক রহ. রাসূলের শরীয়তের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সরকার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সঙ্গে মামুনুর রশীদ বাদশাহর বাতিল মত গ্রহণ করার কারণে মতবিরোধ হয়। মামুনুর রশীদ বাদশাহ বলে কুরআন সৃষ্ট, অথচ এটা সম্পূর্ণ বাতিল কথা। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সত্যের উপর দৃঢ় থাকেন। তিনি সর্বদা বলতে থাকেন– কুরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর বাণী, আল্লাহর বাণী অনদি-অসৃষ্ট। আল্লাহর বাণী সৃষ্ট হইতে পারে না। তিনজন বাদশাহ মামুনুর রশীদ, মু'তাসিম বিল্লাহ, ওয়াসিফ বিল্লাহ পরপর ২৮ মাস যাবৎ তাহাকে জেলে নির্যাতন করিতে থাকে। দৈনিক উলঙ্গ পিঠে ১০টা করিয়া কোড়া মারিতে থাকে। পৃষ্ঠদেশ থেকে ছলছল করিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে, তবুও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও হক মাসআলা বলিতে একটুও ভীত হন নাই বা ত্রুটি করেন নাই। চতুর্থ বাদশাহ মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আসিয়া তাহার গৌরবান্বিত ভূমিকায় মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাহাকে রেহাই দান করেন।

মোঘল বংশীয় দিল্লীর সম্রাট আকবর দুইজন সরকার ঘেঁষা, অর্থলোভী আলেমের সহায়তায় পবিত্র শরীয়তের অনেক মাসআলা পরিবর্তন করিয়া ফেলে। এমনকি শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াকে একেবারে বাতিল করিয়া দীনে ইলাহী জারি করিতে চেষ্টা করে। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর বাদশাহও বাপের অনুকরণ করে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আকবর ও জাহাঙ্গীরের বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে শক্তভাবে দণ্ডায়মান হন। জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে দরবারে ডাকাইলেন। তিনি দরবারে আসিয়া মাথা নত না করিয়া, কুর্নিশ না করিয়া রাসূলের সুন্নাত অনুসারে 'আসসালামু আলাইকুম' বলিলেন। এ অপরাধে জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে গোয়ালিয়রের জেলে কয়েদী করিয়া পাঠাইয়াছিল। মুজাদ্দিদে আলফেসানী ছয় মাস জেলে কয়েদ ভোগ অবস্থায় কয়েদীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করা আরম্ভ করিলেন। ছয় মাস পর জেল মালিক হিন্দু রাজা জাহাঙ্গীর বাদশাহর নিকট রিপোর্ট পাঠাইল, 'আপনি এমন একজন কয়েদী জেলে আটকাইয়াছেন, যাহার প্রচারের ফলে এবং তাহার নৈতিক-আধ্যাত্মিক বলে জেলের পশুগুলি সব মানুষ এবং মানুষগুলি সব দেবতা ও ফেরেশতা হইয়া গিয়াছে'।

এই রিপোর্টে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বাতিল মতবাদ থেকে তওবা করেন। হক্কানী আলেমদের বাতিল রাজ-শক্তির দ্বারা এই নির্যাতন ভোগ করার নযীর অনেক রহিয়াছে। আবার লোভী, স্বার্থপর, সরকার ঘেঁষা আলেম নামধারী, আলেম নামে কলঙ্ক লেপনকারীদের সংখ্যারও অভাব নাই। আসল জিনিস দেখতে হইবে যে, এ সম্পর্কে আল্লাহ এবং রাসূল কী ফয়াসালা দিয়াছেন।

আল্লাহর ফয়সালা বলআম বাউরার ঘটনার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরকার ঘেঁষা আলেম, পীর নামধারীদের সম্পর্কে কী বলিয়া গিয়াছেন? কী হিদায়াত দান করিয়া গিয়াছেন? সেই সম্পর্কে কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠকদের সামনে উদ্ধৃত করিতেছি।

ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء. (مشكاة المصابيح ١/٥٧)

অর্থ : আলেম– যাহারা সৎ আলেম, তাহাদের চেয়ে ভালো, নবীদের পরে মানব সমাজের মধ্যে আর কেউই নাই। কিন্তু আলেম হয়ে যদি অসৎ আলেম হয় অর্থাৎ বে-আমল অর্থাৎ লোভী হয় তবে সেইরূপ আলেমের চাইতে নিকৃষ্ট ও খারাপ আর কেউই নাই। সমস্ত মানব জাতির মধ্যে তাহারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে খারাপ।

এইরূপ খারাপ আলেমদের হাদীসের ভাষায় علماء سوء 'উলামায়ে ছু' অর্থাৎ অসৎ আলেম বলা হইয়াছে। তাহাদের যে ভীষণতম আযাব হইবে এ কথাও হাদীসে পরিষ্কার বলা হইয়াছে এবং মুসলিম সরকারকে এবং মুসলিম জনসাধারণকে তাহাদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য এবং তাহাদের থেকে দূরে থাকার জন্য অতি কঠোর ভাষায় সতর্কবাণী দান করা হইয়াছে। দয়ার নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কথাই আমাদের আগের থেকেই বাতাইয়া গিয়াছেন।

হাদীসে হযরত বলিয়াছেন,

من قرأ القرآن وتفقه في الدين ثم أتى صاحب سلطان طمعا لما في يديه طبع الله على قلبه وعذب كل يوم بلونين من العذاب لم يعذب به قبل ذلك. (كنز العمال ١٤/٣٩)

অর্থ : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিয়া এবং কুরআন-হাদীসের বিদ্যার গভীর জ্ঞান হাসিল করিয়া সরকার থেকে কিছু পাওয়ার লোভে সরকারি দরবারে যাতায়াত করবে অর্থাৎ সরকার ঘেঁষা হইবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার দিলের উপর মোহর মারিয়া দিবেন এবং তাহাকে দৈনিক এমন দুই প্রকার সাংঘাতিক শাস্তি ও আযাব দেওয়া হইবে, যা তাহার পূর্বে অন্য কাউকে দেওয়া হয় নাই, তাহার পূর্বে এত বড় আযাব আর কখনো হয় নাই।

হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,

العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم. (كنز العمال للمتقي الهندي ٣٧١/١٠)

অর্থ : আলেমগণ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দাদের জন্য আমানত গচ্ছিত গ্রহণকারী। কিন্তু যে আলেমগণ আলেম হওয়া সত্ত্বে দুনিয়ার লোভে সরকারের দরবারে যাতায়াত করবে এবং টাকার লোভী হইবে, সেই সমস্ত আলেমগণ আলেম হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের আমানতে খেয়ানতকারী প্রমাণিত হইবে। অতএব হে মুসলিম সরকার! ওহে মুসলিম জনসাধারণ! তোমরা সকলেই এই ধরণের আলেম থেকে সতর্ক থাকিও এবং তাহাদের থেকে অতি সতর্কতার সহকারে দূরে থাকিও।

হযরত বড় পীর সাইয়িদুনা আব্দুল কাদের জিলানী রহ. উলামায়ে ছু সম্বন্ধে বলিতেছেন,

ويل لأمتي من علماء السوء يتخذون هذا العلم تجارة يبيعونها من أمراء زمانهم ربحا لأنفسهم لا أربح الله تجارتهم. (كنز العمال ٤٠/١٤)

অর্থ : হে যুবক ভাইগণ! আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করিতেছেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল। সেই জন্যই আল্লাহ যখন তখন ধরপাকড় করিতেছেন না; তিনি যখন পাকড়াও করিবেন, তাঁহার পাকড়াও হইবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

কতকগুলি লোক আছে আলেম নামধারী, তাহারা আল্লাহর হুকুম-আহকামের ইলম ও জ্ঞান কিছুটা হাসিল করিয়াছে বটে কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান হাসিল করে নাই, আল্লাহকে চিনে নাই, আল্লাহর মারেফাত তাহারা পায় নাই; তাহারা অন্য লোকদেরে অসৎ কাজ করিতে নিষেধ করে কিন্তু নিজেরা অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকে না, তাহারা অন্য লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আসার জন্য দাওয়াত দেয়, উৎসাহ দেয় কিন্তু নিজেরা আল্লাহর থেকে দূরে ভাগিয়া থাকে, আল্লাহর সামনে আল্লাহর নাফরমানী কাজ করে, বড় বড় গুনাহের কাজও করে, তাহাদের নাম সব আমার কাছে তারিখওয়ার লেখা আছে। খবরদার! তাহাদের কারণে আপনারা ধোঁকা খাইবেন না, ধোঁকায় পড়িবেন না। হে খোদা! আমারও গুনাহ মাফ করিয়া দাও, তাহাদেরও গুনাহ মাফ করিয়া দাও।

হে যুবক বন্ধুগণ! আপনারা আল্লাহকে এবং আল্লাহর খাঁটি আলেম ও আউলিয়াগণকে চিনিতে পারেন নাই। সেই জন্যই হয়ত আল্লাহর শানে এবং আল্লাহর খাঁটি আলেম ও আউলিয়াগণের শানে কটুক্তি করিতেছেন। কিন্তু সাবধান! আমার কথা শুনুন এবং নিজেদের জীবন গঠন করুন। নিশ্চয় জানিবেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই সত্য, আল্লাহ মিথ্যা নন। আমরা তাঁহার সৃষ্টি।

আল্লাহ মানুষকে একটি কলব রূহ (বিবেক) ও একটি নফসও (মন) দান করিয়াছেন। বিবেকের মধ্যে থাকে সত্য এবং আল্লাহর গুপ্ত রহস্যাবলী এবং আল্লাহর কালামের সত্য অর্থাবলী এবং নফসের মধ্যে এবং মনের মধ্যে থাকে আল্লাহ বিরোধী নানাপ্রকার কু-প্রবৃত্তি, কুসংস্কার এবং কু-অভ্যাসাদি। এই কলবও যাবৎ পর্যন্ত অনাদি, অনন্ত, চির-জীবন্ত, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে শক্ত এবং শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপন না করিতে পারিবে, তাবৎ পর্যন্ত সে কিছুতেই নাজাত এবং মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

আশ্চর্য আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য, একই মুখ দিয়া বাহির করা হয় কথা। নফসের মিথ্যা কথা এবং রূহের সত্য কথা একই মুখ দিয়া বাহির হয়। সৎ লোকেরও যেমন একখানা মুখ; চোরের, ধোঁকাবাজেরও তদ্রূপ একখানা মুখই থাকে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! চিনার উপায় কী?

হে ভাইগণ! চিনবার জন্য কোন উপায় নাই, অন্য কেউ চিনলেও তাহাতে তোমার কোন ফায়দা নাই। তোমারই চিনিতে হইবে কুরআন ও হাদীসের আলোতে। তুমি একা একা বসিয়া এক আল্লাহকে হাজির-নাজির জানিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি কার দাসত্ব করিতেছ? তোমার মধ্যে হুব্বে মাল, হুব্বে রিয়াসাত আছে কি না? না মালের দাসত্ব, নফসের দাসত্ব, প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া মাল চাহিতেছ? উত্তম খানা, উত্তম পোশাক, উত্তম বিল্ডিং, উত্তম ফার্ণিচার, উত্তম ব্যাংক-ব্যালান্স, উত্তম উপাদেয়– মিষ্টি খাদ্য উপভোগ, গাড়ি হউক, বাড়ি হউক, সব জায়গা থেকে সম্মান আসুক, নেতৃত্ব আসুক, এই চাহিতেছ? এ তোমার মনে?

প্রশ্নের উত্তর আমাকে দেওয়ার দরকার নাই। গভীর রাত্রে একা একা বসিয়া চিন্তা কর, এ প্রশ্নের উত্তর আলিমুল গায়েব আল্লাহর দরবারে, আলিমুল গায়েব আল্লাহকে দিতে পারিবা কি না? যদি আল্লাহকে উত্তর দিতে পার যে, তুমি খাঁটি আল্লাহর বান্দা, তবে তো তুমি মুমিন, নতুবা মুনাফিক। আমি তোমাকে মুনাফিক বলিতেছি না, তুমি নিজের বিচারে, আল্লাহর বিচারে মুনাফিক।

সত্য-নির্মল কলব ও বিবেক অনবরত সমস্ত সৃষ্টিকে বাদ দিয়া তাহাদিগকে পাছে ফেলিয়া স্রষ্টার দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতে এবং সফর করিতে থাকে। পথিমধ্যে অনেক রকমের মোহ তাহাকে টানিয়া ধরে, কিন্তু সে সবাইকে সালাম করিয়া (এড়াইয়া) আগে চলে যায়, কারোর দিকে সে ফিরে চায় না, কেউ তাহার পথে বাধা দিতে পারে না।

যাহারা উলামায়ে হক্কানী, তাহারা তাহাদের ইলম অনুযায়ী আমল করেন। তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে নায়েবে নবী, সালাফে সালেহীনদের কায়েম মাকাম এবং কালের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাহাদের ব্যক্তিগত, স্বার্থগত কোন মকসূদ থাকে না, তাহাদের একমাত্র মকসূদ থাকে আল্লাহর দ্বীন জারি, নবীর শরীয়ত জারি।

সেজন্য তাহারা জীবনের উপর বিপদ আসিলেও জীবনভর কাহারো পরোয়া না করিয়া আমর বিল মা'রূফ (সৎ কাজের আদেশ) ও নাহী আনিল মুনকার (বদ কাজে নিষেধ) করিতে থাকে।

আল্লাহ উলামায়ে ছু'র উদাহরণ দিয়াছেন কুত্তার সঙ্গে এবং গাধার সঙ্গে।

আলেম খাঁটি কি না চিনিবার আর একটি আলামত এই যে, আলেম খাঁটি হইলে তাহার ইলম যত বাড়িবে, ততই তাহার ভয় বাড়িবে এবং আল্লাহর ফরমাঁবরদারী বাড়িবে।

যাহাদের আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন বাড়িবে না, আল্লাহর ভয়ে সন্দেহের জিনিসের থেকে বাঁচিয়া থাকার পরহেযগারী বাড়িবে না, আল্লাহর ভয়ে নিজের ভুল স্বীকার বাড়িবে না, আল্লাহকে রাজি করার কষ্ট করা বাড়িবে না, বার বার আল্লাহর ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা বাড়িবে না, নফসকে শাস্তি দেওয়া বাড়িবে না, নফসের সঙ্গে কঠোর জিহাদ বাড়িবে না, নফসকে আদব শিক্ষা দেওয়া এবং অনবরত মুজাহাদা করা বাড়িবে না এবং আল্লাহর নূর হাসিল করার জন্য অনবরত কষ্টের জীবন-যাপনের স্পৃহা বাড়িবে না, নফসের সঙ্গে, শয়তানের সঙ্গে দুশমনী করা বাড়িবে না, পক্ষান্তরে বাড়িবে এই চিন্তা– কাপড় ভালো হউক, খানা-পিনা ভালো হউক, কুরছি-চেয়ার ভালো হউক, লেবাস-পোশাক ভালো হউক, হছব-নছব ভালো ও বড় মানুষের সঙ্গে হউক, বড় লোকদের সঙ্গে উঠা-বসার সুযোগ হউক, পার্টিতে দাওয়াত হউক। তবে বুঝা যাইবে যে, সে আর আলেমে হক্কানী নাই– সে আলেমে ছু অর্থাৎ অসৎ হইয়া গিয়াছে। হে ভাই! এসব জিনিসের চিন্তা তুমি নিজের থেকে দূর করিয়া দাও। (মাকতুবাত)

সৌজন্যেঃ মুজাহিদে আযম, আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) গ্রন্থাবলী – ১ম খণ্ড

ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মাওলানা আব্দুল মালেক

ইতিহাস একটি বিদ্যালয়। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা তাতে লাভ করে আলোকিত আগামীর সন্ধান। কেননা ইতিহাসের মাধ্যমে অতীতের ঘটনাবলী এবং স্মরণীয় বরণীয় মনীষীদের বর্ণাঢ্য জীবন চিরঞ্জীবরূপে পাঠকের সামনে চলে আসে। ইতিহাস তার পাঠকের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনার উৎকর্ষ সাধন করে; তার শিষ্টাচার, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সমৃদ্ধ করে– যে দূরদর্শিতা তার বর্তমানকে আলোকিত ভবিষ্যতের পথে পৌঁছে দেয়।

ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. (৮০৮হি.) *তারীখে ইবনে খালদুন*-এর ভূমিকায় ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে এ বিষয়টিকেই চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন,

'ইতিহাস হল মানবজাতির সমাজ ব্যবস্থার সংবাদসমূহ, যাকে পুঁজি করে গড়ে ওঠে বিশ্বসভ্যতা। যে সভ্যতায় যেমন আছে দয়ার্দ্রের দয়া, তেমন আছে হিংস্রতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগসহ মানবীয় বিভিন্ন দুর্বলতার অশুভ ছায়া। যে সভ্যতার পাটাতনে গড়ে ওঠে রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের ভিত্তি। মোটকথা, মানুষের উদ্ভাবন, জীবনাচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ প্রকৃতিগত যাবতীয় অবস্থাসমূহের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা মানব সভ্যতার নামই ইতিহাস।' (তারীখে ইবনে খালদুন ১/৩৬)

ইতিহাসের গুরুত্ব

ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাসের সেতুবন্ধনের মাধ্যমে সময়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে বর্তমানের শিক্ষার্থী পৌঁছে যায় দূর অতীতের সান্নিধ্যে। সময়ের উত্থান-পতন ও আলো-আঁধারের তুলিতে সে এঁকে নিতে পারে ভবিষ্যতের স্বচ্ছ নিখুঁত চিত্র।

এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস এবং পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের স্বজাতির শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.

অর্থ : আর আমি আসমানসমূহ ও যমীনকে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী বস্তু-সমূহকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। (সূরা ক্বাফ-৩৮)

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.

অর্থ : আর আমি রাসূলগণের ঘটনাবলী হতে এসব ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করছি, যার দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে সবল করি। (সূরা হুদ-১২০)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.

অর্থ : আর তাদের ঘটনাবলীতে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশ। (সূরা ইউসুফ-১১১)

ইতিহাস জানার গুরুত্ব প্রমাণে উল্লিখিত আয়াতের ভূমিকা প্রসঙ্গে আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. (৯০২হি.) বলেন,

وكفى بهذا اى آية وكلا نقص الخ دليلا على جلالة علم التاريخ وفضله وفخامة قدر صاحبه ونبله.

অর্থ : ইতিহাস শাস্ত্রের গুরুত্ব ও উপকারিতা এবং এ শাস্ত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তির মর্যাদা প্রমাণে উল্লিখিত আয়াতই যথেষ্ট। (আল-ই'লান বিত-তাওবীখ; পৃষ্ঠা ১৬)

মানবাত্মার সংশোধন, ঈমান-ইয়াকীনের পরিশোধন ও সৎকর্মে অনুসরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস জানার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ কারণে হাদীসেও হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকে জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে كتاب بدء الخلق (সৃষ্টির সূচনালগ্নের ইতিহাস অধ্যায়) এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

পবিত্র কুরআনে এবং হাদীস শরীফে ইতিহাস শাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কেবল উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে পাঠের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআন-হাদীসের নির্যাস ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের কাছেও ইতিহাসের গুরুত্ব বর্ণনাতীত।

হাদীস শাস্ত্রে ইতিহাস নির্ভরশীলতার বিষয়টি তো হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা সাখাবী রহ. (৯০২হি.) এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই প্রতীয়মান হয়,

ومن أجل فوائده انه احد الطرق التى يعلم بها النسخ فى احد الخبرين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما.

অর্থ : ইতিহাসের সবচে বড় বাহ্যিক উপকারিতা হল, ইতিহাস জানার দ্বারা বিরোধপূর্ণ দু'টি হাদীস– যার মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়– তার কোনটি রহিতকারী আর কোনটি রহিত তা জানা যায়। (আল-ই'লান বিত-তাওবীখ; পৃষ্ঠা ৭)

আর দৈনন্দিনের নিত্য নতুন সমস্যার সমাধানক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রে ইতিহাসের গুরুত্ব প্রতীয়মান হয় ইমাম শাফেয়ী রহ. (২০৪হি.) এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকে।

دأبت في قراءة علم التاريخ كذا وكذا سنة وما قرأته إلا لأستعين به على الفقه.

অর্থ : আমি দীর্ঘ কয়েক বছর কেবল ফিকহ শাস্ত্রে সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে ইতিহাস পাঠে আত্মনিয়োগ করেছি। (*আল-ইসতিকসা লিআখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*-এর ভূমিকা)

কেননা শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানই সামাজিক প্রচলন নির্ভর। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরামের অনেক সিদ্ধান্তই স্থান ও কাল ভেদে পরিবর্তন হয়। আর ইতিহাস পাঠে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক প্রচলন জানা সম্ভব হয়।

মোটকথা, ঈমান-ইয়াকীনের বিশুদ্ধতা, উন্নত নৈতিকতা, সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতা আর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এসব কিছুই হল ইতিহাস জানার অপরিহার্য উপকারিতা। ইতিহাস জানার এ সারমর্মটুকু অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন হযরত আবুল হাসান আলী।

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

পূর্ববর্তীদের কর্মগুণে প্রাপ্তি ও কর্মদোষে বঞ্চনার বর্ণনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ, ঈমান-ইয়াকীন বিশুদ্ধকরণ এবং সুন্দর আগামীর জন্য অতীতের আয়নায় বর্তমানকে সচিত্র অবলোকন করতে পারাই ইতিহাস পাঠের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

এর পাশাপাশি উম্মতের أولو الالباب তথা দূরদর্শী পূর্বসূরীগণ কুরআন-হাদীসে বিবৃত ইতিহাসের বহুবিধ উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আমরা তার কিছু তুলে ধরছি। ইতিহাস পাঠকালে এগুলোর উপস্থিতি, উপলব্ধি এবং তা কাজে পরিণত করার মানসিকতা তৈরি করা ইতিহাস পাঠকের জন্য আবশ্যক।

হযরত আবূ ইসহাক সালাবী রহ. বলেন,

১. এসব ঘটনাবলীর বর্ণনা হযরত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ বহন করে। কেননা

কিতাব পাঠ ও শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত অতীতের ঘটনাসমূহের সুস্পষ্ট বর্ণনা ওহী ব্যতীত কোনভাবেই সম্ভব নয়।

২. পূর্ববর্তী উম্মতের কার্য পদ্ধতি থেকে উপদেশ গ্রহণ সম্ভব হয়।

৩. উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা অন্যান্য উম্মতের শরীয়ত উম্মতে মুহাম্মদীর শরীয়তের তুলনায় কঠিন প্রতীয়মান হয়।

৪. পূর্ববর্তী উম্মতের সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সুনাম-সুখ্যাতির বর্ণনা পাঠে ভালো আমলের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়। (আল-ই'লান বিত-তাওবীখ; পৃষ্ঠা ১৬, ১৭)

আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. (৬৩০হি.) *আলকামেল ফিত তারীখ* গ্রন্থে (১/৯-১০) লিখেছেন,

ইতিহাস পাঠের ইহকালীন উপকারিতা

১. বাদশাহ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন অতীতের অত্যাচারী এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে অবগত হবে এবং দেখতে পাবে সেই অনাচারী জালিমরা ইতিহাসের পাতায় প্রজন্মের পর প্রজন্মের কলমে কী কলুষিত ভূমিকায় চিত্রিত হয়ে আসছে! আর অবলোকন করবে তাদের অনাচারের তাণ্ডবে জনপদ ও জনপদবাসীর ধ্বংস-বরবাদীর চিত্র– তখন নিজেরা সে সকল অত্যাচারীর মত ও পথ থেকে বেঁচে থাকবে।

২. পাশাপাশি ইতিহাসের পাতায় যখন তারা প্রত্যক্ষ করবে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের উত্তম জীবনাচার, মৃত্যু পরবর্তী সুনাম-সুখ্যাতি, তাদের হাতে দেশ ও সাম্রাজ্যের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তখন তারা সে সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির জীবনী গ্রহণে উৎসাহিত হবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সবকিছু থেকে বিরত থাকবে।

৩. ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। বিভিন্ন ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে দূরদর্শিতা তৈরি হয়। কেননা প্রত্যেক ঘটনারই দৃষ্টান্ত অতীতে বিদ্যমান থাকে।

৪. বিভিন্ন মজলিসে সমৃদ্ধ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপনের যোগ্যতা তৈরি হয়।

পরকালীন উপকারিতা

দূরদর্শী ব্যক্তি যখন অতীতের ইতিহাসে পরিবর্তনশীল দুনিয়ার ভয়ঙ্কর বৈচিত্র অবলোকন করে তখন সে উপলব্ধি করে, মায়ার এ দুনিয়া ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সম্মানিত কিংবা লাঞ্ছিত কাউকেই তার বুকে বেশি দিন ধরে রাখেনি, কেউই তার রূঢ় আচরণ থেকে রেহাই পায়নি তখন সে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী হবে এবং আখেরাতের প্রতি ধাবিত হবে। হযরত আবুল হাসান আলী আল মাসউদী রহ. অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইতিহাসের বহুবিধ উপকারিতার সুন্দর উপস্থাপনা করেছেন। তিনি বলেন,

ومكارم الاخلاق ومعاليها منه تقتبس وآداب سياسات الملوك وغيرها منه تلتمس يجمع لك الاول والآخر والناقص والوافر والبادى والحاضر والموجود والغابر وعليه مدار كثير من الاحكام.

অর্থ : ইতিহাস পাঠে উত্তম চরিত্র এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অর্জিত হয়। সূচনা ও সমাপ্তির, পূর্ণ ও অপূর্ণের, গ্রাম্য ও শহুরের, অতীত-বর্তমান জীবনাচার পাঠকের সামনে চলে আসে এবং এ ইতিহাসের উপরই অধিকাংশ আহকামের ভিত্তি। (আল-ই'লান বিত-তাওবীখ; পৃষ্ঠা ১৭)

মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন-এ আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. (৮০৮হি.) এর উক্তি থেকেও এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। ইতিহাস শাস্ত্রের মাহাত্ম্যের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الامم في أخلاقهم، والانبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا.

অর্থ : ইতিহাস পাঠে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের স্বভাব ও শিষ্টাচার, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জীবন চরিত, রাজ-বাদশাহদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অবগতি লাভ হয়। ফলে অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তির জন্য দুনিয়া আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা সম্ভব হয়। (তারীখে ইবনে খালদুন ১/৯)

অতীতের ইতিহাস জানার উল্লিখিত বহুবিধ উপকারিতা লক্ষ্য করে কুরআন-হাদীসে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের উম্মতের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। এ কারণেই আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে (১/২৮) বলেন,

وكان من أعظم نعمه عليهم وإحسانه إليهم بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر لهم السبيل وأنطقهم أن أرسل رسله إليهم وأنزل كتبه عليهم مبينة حلاله وحرامه وأخباره وأحكامه وتفصيل كل شئ في المبدإ والمعاد إلى يوم القيامة.

অর্থ : মানবকুলকে অস্তিত্ব প্রদান, রিযিক প্রদান, দুনিয়ায় আগমনকে সহজীকরণ, মনের ভাব প্রকাশের যোগ্যতা প্রদান, রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব অবতীর্ণ করনের পর তাদের প্রতি আল্লাহর সর্বাধিক অনুগ্রহ হল, বৈধ-অবৈধ এবং ইতিহাস-বিধানাবলী বর্ণনা করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত আদি-অন্তের সবকিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/২৮)

এছাড়াও ইসলামী ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অমানিশা ভেদ করে ইসলামের প্রকাশ, বিকাশ, উৎকর্ষ ও বিশ্বব্যাপী তার নেতৃত্ব, মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে অবগতি লাভ হবে। পাশাপাশি মুসলমানদের বর্তমান দুর্বলতা ও হীনতার কারণ সম্পর্কেও বোধদয় ঘটবে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিয়াঁ নদবী (১৪২১হি.) এর বিখ্যাত গ্রন্থ (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?* গ্রন্থের ভূমিকায় মিশরের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব রহ. লিখেছেন,

'পাঠক (এ কিতাবে ইসলামী ইতিহাস পাঠ করে) আরো অনুভব করবে, দিশেহারা মানব কাফেলাকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য ইসলামী নেতৃত্বের কী অপরিসীম প্রয়োজন এবং এই নেতৃত্বের অনুপস্থিতি মানুষের জন্য কী ভয়ঙ্কর ও বেদনাদায়ক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সত্য কথা হল মুসলমানদের নেতৃত্বের আসন থেকে দূরে সরে আসার কারণে যে ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসে তা শুধু মুসলমানদের জন্যই নেমে আসে না; বরং তা গোটা মানব জাতিকেই গ্রাস করে ফেলে।'

সুতরাং মানব জাতির অস্তিত্বের সুরক্ষার স্বার্থেই ইসলামী ইতিহাস জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আফসোসের বিষয় যে, আজ মুসলিম জাতির অধিকাংশই তাদের সোনালী অতীত সম্পর্কে অজ্ঞ। আবার কেউ কেউ সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্ত। আরো পরিতাপের বিষয় হল, অজ্ঞতা এবং বিভ্রান্তির প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও আমরা বে-খবর। ফলে এ অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে আমরা শঙ্কাহীন এবং তা থেকে উত্তরণ ও প্রতিকার সাধনে উদাসীন, ঠিক যেমনটি চেয়েছিল ধূর্ত ইংরেজরা।

রাজত্ব দখলের হীন উদ্দেশে ইংরেজরা যখন এ উপমহাদেশে আগমন করে

তখন গোটা ভারতবর্ষ ছিল মুসলিম শাসনাধীন। সাম্রাজ্যবাদী এ শেয়ালগুলো ভালোভাবেই বুঝেছিল, এ দেশের অস্তমিত স্বাধীনতার সূর্য ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা একমাত্র মুসলমানেরই আছে। সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ., টিপু সুলতান, কাসেম নানুতবী, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর মত বীর মুজাহিদ কর্তৃক পরিচালিত আযাদী আন্দোলন ইংরেজদের এ উপলব্ধিকে আরো মজবুত করেছিল।

মুসলমানদের এ সংগ্রামী চেতনা নির্বাপনের একমাত্র পন্থা ছিল মুসলমানদেরকে তাদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস ও বীরত্বগাথা ভুলিয়ে দেয়া; অন্তত এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে ফেলে জিহাদী জযবার আগুনে পানি ঢেলে দেয়া। কাজেই খোলা হল ভেজাল ইতিহাস তৈরির কল-কারখানা। কুরআন-হাদীসের বর্ণনাকে বিকৃত করে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত সাম্প্রদায়িকতার বিষমিশ্রণে ইংরেজ কারিগর প্রস্তুত করল মুসলমানদের ইতিহাস। সে ইতিহাসে মুসলমানদেরকে উপস্থাপন করা হল খুনী, লুটেরা, বিলাসপ্রিয়, বিদ্বেষী এবং অত্যাচারে সিদ্ধহস্ত জাতি হিসেবে। তারা গাদ্দার আর ক্ষমতার কাঙ্গালকে দিল The Great উপাধি। আর জনদরদী, পরোপকারী, দূরদর্শী ও মানবহিতৈষীকে দেয়া হল অত্যাচারী'র আখ্যা। ধীরে ধীরে মুসলমানদের জ্ঞানপ্রিয়তা, বিজ্ঞানমনস্কতা, অবিস্মরণীয় বীরত্ব, পৃথিবীব্যাপী নেতৃত্ব, চারিত্রিক উৎকর্ষ, সততা, মহানুভবতা, আকাশছোঁয়া উদারতা এককথায় গৌরবোজ্জ্বল সব ইতিহাস চাপা পড়ল।

তারপর ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের রচিত কিংবা তাদের মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে লিখিত বিকৃত তথ্য সম্বলিত এ গ্রন্থগুলো ইসলামের ইতিহাস নামে উপমহাদেশের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পাঠ্যক্রমের অংশ হয়ে গেল। ফলে মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম ইসলামের সঠিক ইতিহাস কেবল বিস্মৃতই হল না; বিকৃত ইতিহাসের বিষক্রিয়ায় চিন্তা-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সব ক্ষেত্রে ইসলাম বিদ্বেষী আর ইংরেজদের অনুকারী হয়ে উঠল।

পরিতাপের বিষয় হল, ইংরেজ বিতাড়নের শত বছর পরও সেই বিকৃত কিংবা অসম্পূর্ণ ইসলামী ইতিহাস এখনো আমাদের স্কুল-কলেজে পড়ানো হচ্ছে। ফলে সে ইতিহাসের বিষক্রিয়া থেকে আমরা আজো মুক্ত হতে পারিনি, পারিনি ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জেনে সংস্কৃতিক ও মনোজ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ইসলামী তাহযীব মতে জীবনকে ঢেলে সাজাতে। এ আমাদের চরম ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতার দায় ঘোচাতে এবং ঈমান-ইয়াকীনের বিশুদ্ধতা, উন্নত নৈতিকতা, সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতা আর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিম জাতির নিজেদের অতীত ইতিহাস জানা এখন দীন-ধর্ম ও সময়ের জরুরী দাবি। এ দাবি পূরণের জন্য কুরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনা আশ্রিত এবং সকল প্রকার অসাধুতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে ইনসাফের কলমে রচিত মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনাবলীর উদ্ধৃতিই হয়তো যথেষ্ট হতো। কিন্তু কুরআন-হাদীসের তাত্ত্বিক আলোচনাসমৃদ্ধ এ গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় এবং সুবিশাল কলেবরের হওয়ায় স্বভাবতই সাধারণ পাঠক তাতে আগ্রহবোধ করবেন না কিংবা তা থেকে আশানুরূপ উপকৃত হতে সক্ষম হবেন না। এ জন্যই বক্ষমান উপস্থাপনায় ইতিহাস লিখনের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক 'রাবেতা'য় ধারাবাহিকভাবে পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে ইসলামের অভ্যুদয় ও তার পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তবে এ আলোচনা বিস্তৃত ইতিহাসের স্বতন্ত্র কোন রচনা নয়; রচিত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য বিবরণ মাত্র। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। **(চলবে ইনশাআল্লাহ)**

লেখক: বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

লেখা আহ্বান

উলামায়ে কেরাম, প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক বিশেষত আবনায়ে রাহমানিয়া ও রাবেতা লেখক ফোরামের খিদমতে রাবেতার পক্ষে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। রাবেতার নিয়মিত বিভাগসহ দীন ও উম্মাহর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে লেখা পাঠানো যাবে।

শর্তাবলী

- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও মাসলাকে দেওবন্দের অনুকূল হতে হবে।
- সমসাময়িক বিষয় সংক্রান্ত লেখা অগ্রাধিকার পাবে।
- ফুলস্কেপ সাদা কাগজে পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।
- সম্পাদনার ক্ষেত্রে রাবেতার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না।
- রাবেতার ই-মেইলে, ডাকযোগে অথবা সরাসরি রাবেতার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে লেখা জমা দেয়া যাবে।

বি.দ্র. 'পাঠক মন্তব্য' কলামে মতামত/পরামর্শ/ গঠনমূলক সমালোচনা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-কর্তৃপক্ষ

পা নি ন য় ! ম রী চি কা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... ***অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)***

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-৪

দারুল উলূম দেওবন্দের বুযুর্গ উস্তাদ হযরত সাইয়েদ মিয়াঁ আসগর হুসাইন সাহেব রহ.লিখিত একটি পুস্তিকা, যাকে কেউ বলে 'মুসীবতনামা' আর কেউ বলে 'নসীহতনামা'। ইফতা বিভাগের ছাত্র থাকাকালে পুস্তিকাটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। পুস্তিকার বিষয়বস্তু হল ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ায় মানুষ শান্তির আশা করতে পারে এবং শান্তির জন্য চেষ্টাও করতে পারে। বরং শরীয়তের সীমারেখার ভিতরে থেকে চেষ্টা করে যাওয়া মুমিনের দায়িত্বও বটে। কিন্তু শান্তি পাওয়া-না পাওয়া তাকদীরের ব্যাপার। তাছাড়া নির্ভেজাল ও স্থায়ী শান্তির জায়গা দুনিয়া নয়। মুমিন-কাফির, সৎ-অসৎ কারো জন্যই নয়। এমনও হতে পারে, শান্তির খোঁজে সারাটি জীবন ব্যয় করা সত্ত্বেও মুসীবত তার পিছু ছাড়বে না। আর হিসাব-নিকাশে ভুল করলে তো শান্তির চেহারাও দেখবে না। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি এ ক্ষেত্রেও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিবর্তে সপ্রসংশ সবর করে যাবে। ভুল হলে সংশোধনের পথ খুঁজবে। আর এর বিনিময়ে চিরস্থায়ী পরকালে নির্ভেজাল ও শান্তির আবাস জান্নাত লাভ করবে।

মিয়াঁ সাহেব রহ. পুস্তিকাটি রচনা করেছেন জীবনব্যাপী মুসীবতগ্রস্ত অথচ আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট এক আল্লাহর বান্দা মৌলভী জামালুদ্দীনকে কেন্দ্র করে। পুস্তিকাটি পড়তে গিয়ে কখনো চোখ অশ্রুসজল হয়েছে, কখনো হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়েছে- যেখানে মনে হয়েছে মৌলভী জামালুদ্দীন নিজের অসতর্কতার কারণেই এই মুসীবতে পড়েছে।

এমনই এক জামালুদ্দীন (ছদ্মনাম) আমার নিয়মিত মুসল্লী ছিলেন। যাকে শরীরের বাহ্যিক অবয়ব দেখে মানুষ তাকে সুস্থ-সবল মনে করত। কিন্তু ভিতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল বেশ আগেই। অতঃপর সেই ছাইয়ে নিভু নিভু আগুন জ্বলছিল সর্বক্ষণই। ঘনিষ্টরা তার কাছে গেলে তারাও সে আগুনের তাপ কিছুটা অনুভব করতো।

ভাই জামালুদ্দীনের ছিল দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান। তিনি সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন। বড় কন্যা ও পুত্রকে পড়াশোনা শেষ করিয়ে বিয়ে-শাদী দিয়ে দিয়েছেন। পুত্রবধু উচ্চ শিক্ষিতা এবং একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকুরীরত। আর মেয়ের জামাইও শিক্ষিত, অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। বিয়ের পর স্ত্রীকেও অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গেছেন। কিছুদিন পর স্ত্রীর ছোট বোনকেও স্টুডেন্ট ভিসার ব্যবস্থা করে বড় বোনের কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। জামাল ভাইয়ের পুত্র ও পুত্রবধু দু'জনেই চাকুরী করেন। আর মেয়ে বড়টা স্বামীর সাথে এবং ছোটটা বড় বোনের সাথে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে।

দেশের সফল পিতাদের শীর্ষ তালিকায় জামাল ভাইয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা। সন্তানদের শান্তিময় ভবিষ্যত দেখে জামাল ভাইয়ের বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের জোয়ার পরিলক্ষিত হওয়ার কথা। খেযাব লাগান চুল-দাড়ি দেখে অনেকে তাকে নিরোগ জোয়ান পুরুষের মতই মনে করত। এমনকি আমিও কিছুদিন এ ভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম। অথচ তার মনের দুনিয়ায় অশান্তির ঝড়ো হাওয়া লণ্ডভণ্ড করে চলছিল শান্তির সকল বাগ-বাগিচা।

পুত্রের ঘরে এক পুত্র সন্তান। চার মাস ছুটি কাটানোর পর নিয়মিত অফিস করেন পুত্রবধু। নবজাতকের চাকুরিজীবী মা বলে কথা। নবজাতকের মতই সকল সুবিধা ভোগ করছেন মাও। তৈরি খাবার-দাবার, ধোয়া ও ইস্ত্রি করা কাপড়-চোপড়, রেডি বেড-বিছানা, মাঝে-মধ্যে বাবুকে সামান্য আদর-সোহাগ করা ছাড়া ঘরে আর কোন ডিউটি নেই তার। এত সুবিধার পরও সংসারের প্রতি তার কেমন গা ছাড়া ভাব। স্বামী বেচারা নিতান্তই রুমমেট। স্ত্রী মাঝে-মধ্যে রাতেও বাসায় ফেরে না। কখনো একাধারে কয়েক রাত। স্বামী বেচারা বিরক্ত। শ্বশুর-শাশুড়ী বিচলিত। কোথায় ছিল জানতে চাইলে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কখনো বলে কলিগদের সাথে সিলেটে গিয়েছিলাম। কখনো বলে কক্সবাজার-কুয়াকাটায় ট্যুরে গিয়েছিলাম। ইত্যাদি ইত্যাদি। জামাল ভাইয়ের ছেলেটা বড় ভদ্র মানুষ। এ বয়সেই সুন্নাতি দাড়ি ও জামা-পাজামাসহ মোটামুটি দীনদার যুবক। ইজ্জতের খাতিরে কিছুদিন চোখ থাকতেও অন্ধ সেজে রয়েছেন। অতঃপর এক সময় এ স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা অসম্ভব ভাবতে শুরু করেছেন।

শ্বশুর-শাশুড়ী শুধু নাতিকে নিয়ে চিন্তিত। অন্যথায় এমন পুত্রবধু স্বেচ্ছায় বিদায় হলে তারা যেমন বাঁচে, তাদের ছেলেটাও বাঁচে। কিন্তু 'ধোপার কুকুর, না ঘরকা, না ঘাটকা'। ক্ষণিকের সাথিরা কেউ জীবন সাথী হতে রাজি হয় না, বিধায় জামাল ভাইয়ের পরিবারের মাথার উপর থেকে এ বোঝা নিজ থেকেই দূর হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। জামাল ভাইয়ের বেশি টেনশন এ নিয়েই।

অবশেষে পুত্রবধু কেন জানি কানাডায় হিজরত করার চেষ্টা শুরু করে এবং সহজে সে চেষ্টায় সফলও হয়ে যায়। অতঃপর স্বামী-পুত্রকে ছেড়ে সেখানে তার কয়েকজন আত্মীয়ের নিকটে গিয়ে থাকা শুরু করে। কিন্তু প্রবাসে গিয়ে সে স্বামীকে খুব মিস করতে শুরু করে। স্বামীর সঙ্গে কথা বলে তাকেও কানাডায় যেতে উদ্বুদ্ধ করে। স্বামীও অন্য চিন্তা বাদ দিয়ে বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে কানাডায় গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে থাকা শুরু করে এবং সেখানেই দেখেশুনে একটা চাকুরি যোগাড় করে নেয়। এ হল আপাতত জামাল তনয়ের কাহিনী।

অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বড় মেয়েকেও আল্লাহ তা'আলা একে একে দু'টি সন্তান দান করেছেন। জামাই মিয়াঁ চাকুরির পাশাপাশি পরিবারের দায়িত্বও পালন করছেন। স্ত্রীর ছোট বোনকেও যথেষ্ট আদর-যত্ন করছেন। অভিভাবক ও শিক্ষক একযোগে উভয়ের ভূমিকাই

পালন করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। এতে স্ত্রীও খুশি আর শ্বশুর-শাশুড়ী তো বেজায় খুশী। স্বামীর এতসব ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য করে স্ত্রী রান্না-বান্না, ঘর মোছা ও কাপড় ধোয়াসহ গৃহস্থলী সকল কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে খুব নিষ্ঠার সাথে। দেশে থাকলে যে তাকে এসব কাজের ধারকাছ দিয়েও যেতে হত না সে কথা যেন সে ভুলেই গেছে। কিন্তু ইদানিং সে লক্ষ্য করছে, এতকিছুর পরও স্বামী যেন দিন দিন তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে উঠছে। অনাসক্তির পর শুরু হয়েছে বিরক্তির পালা। স্ত্রী কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলে বাবা-মাকেও অবহিত করল। বাবা ঘনিষ্ঠদের কাছে আফসোস করে বলত, ছেলেকে বিয়ে করালাম; পুত্রবধুর সব কাজ কাজের বুয়া দিয়ে করিয়েও তাকে স্বামীঅনুরাগী করা সম্ভব হল না। পক্ষান্তরে মেয়েটা কাজের বুয়ার মত ঘরের সব কাজ করেও স্বামীর মন জোগাতে পারছে না। পুত্রবধুর বিষয়টা তো বুঝলাম, সে চাকুরিজীবী, বদদীন পরিবেশের শিকার। উপরন্তু স্বামী তার দাড়িওয়ালা, দীনদারী মতে চলতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়ের সংসারের এ অশান্তির হিসেব তো কোনক্রমেই মিলাতে পারছি না।

জামাল ভাইয়ের হিসেবের এ গরমিল বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। জানতে পারলেন, জামাই বাবুর স্ত্রীর প্রতি অনাসক্তি আর শ্যালিকার প্রতি আসক্তি পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। শ্যালিকা প্রথম দিকে এ অবস্থায় বিব্রতবোধ করলেও এখন রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন বাসা-বাড়ি অনেকটা যেন এদের দুজনেরই। এতে যে বড় বোনের সংসার লাটে উঠছে এ নিয়ে ছোট বোনের কোন মাথাব্যথা নেই। এ সংবাদ জামাল ভাইয়ের কাছে পৌঁছলে তার অবস্থা কেমন হতে পারে চিন্তা করে দেখুন। জামাল ভাইয়ের হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় মিলে গেছে। ছোট মেয়েকে সংবাদ পাঠালেন, তোমার পড়াশোনা যা হওয়ার হয়েছে এবার তুমি দেশে চলে এসো। জামাই বাবু উত্তর পাঠালেন, দেশে নিতে হয় তো বড়টাকে নিয়ে যান। জামাল ভাই ব্যক্তিগতভাবে মোটামুটি দীনদার না হলে আমার ধারণা, আত্মহত্যার চিন্তা-ভাবনা করতেন। কারণ শেয়ালের কাছে মুরগী বর্গাদাতা তিনি নিজেই। কাজেই শেয়াল ও মুরগীর চেয়ে অধিক অপরাধী স্বয়ং তিনি। তারপর অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট জামাল ভাইয়ের শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি। আজ এই টেস্ট কাল ওই টেস্ট, এই করতে করতে এখন আমাদেরকেও আগের মত আর সময় দিতে পারেন না। আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, দু'আ করবেন একটা বড় ধরনের পরীক্ষা আছে। মন থেকে সাহস পাচ্ছি না। একটু ভাল লাগলে পরীক্ষাটা করিয়ে নিব। অতঃপর চিকিৎসা-অপারেশন যা দরকার হয় করাবো।

এরই মধ্যে একদিন দুপুর বেলা আমার সহকর্মী বলল, জামাল ভাইয়ের অবস্থা খুব খারাপ; হাসপাতালে ভর্তি। প্রতিবেশীরা তার জন্য দু'আ চেয়েছেন। বিকেলে সংবাদ পেলাম তিনি ইন্তিকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতির সংবাদ পেয়ে ছেলে খুব দ্রুত দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে রওয়ানা হয়েছেন। কিন্তু ফিরেছেন এমন সময় যখন বাবা চলে গেছেন অন্য জগতে। জানাযার ইমামতি আমিই করালাম।

জানাযার পূর্বে ছেলে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সকলেরর নিকট দু'আ চাইলেন। সকলে দরদ নিয়ে জানাযা পড়ল।

কয়েকদিন পর প্রতিবেশীরা বড় করে দু'আর আয়োজন করলেন। কিন্তু সে দু'আর অনুষ্ঠানে আমার জানামতে নিকটাত্মীয় বলতে কেউ ছিল না। এমনকি ছেলেটাও না। এখন তার ছেলে-মেয়েরা কোথায় কোন হালতে আছে সম্ভবত প্রতিবেশীরাও জানে না।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক: আবু তামীম

(থার্টিফাস্ট নাইট ... ৩৫ পৃষ্ঠার পর)

তখন পরের পথকেই নিজের পথ বলে মনে হয়। আপন হয় পর আর পর হয়ে যায় আপন। বন্ধুকে শত্রু আর শত্রুকে বন্ধু মনে হয়। উন্নতিকে মনে হয় অবনতি আর অবনতিকে মনে হয় উন্নতি। এভাবে ধর্মীয় ও জাতীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত অংশের সাথে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে উন্মুক্ত হয় জাতির আত্মকলহের পথ।

বর্তমানে সমাজের এলিট শ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ প্রবণতা এতটাই প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, ওরা যত অযৌক্তিক ও অনৈতিক প্রথাই উদ্ভাবন করুক না কেন, তারা তা মাথা পেতে গ্রহণ করবে এবং সমাজে তার প্রচলন ঘটাতে সচেষ্ট হবে।

অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, যারা নিজেদের জীবনে মোটামুটিভাবে ধর্মচর্চা করেন, ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা কুরআন-হাদীসের আলোকে তুলে ধরলে কিছুটা প্রভাবিত হন তারাও এখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি চর্চায় আক্রান্ত।

আমাদের চিরায়ত ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার এ নগ্ন আগ্রাসন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রায় সর্বত্রই তার সরব উপস্থিতি চোখে পড়ছে। অশ্লীল চলচিত্র প্রদর্শন, বিজ্ঞাপনে অশালীনভাবে নারীদের ব্যবহার, শুভ সন্ধ্যা ও গুডমর্নিং চর্চা, টাই ব্যবহার, এক মিনিটের নীরবতা পালন, স্মরণীয় ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি নির্মাণ, লাশ বা কফিনে পুষ্পাঞ্জলি-শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান, মৃতের প্রতি শোক প্রকাশের জন্য বিউগল বাজানো, মৃতের স্মরণে গান-বাদ্য করা, অসহায়দের সেবার জন্য নৃত্য অথবা গান-বাজনার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা, বাসস্থান এমনকি শয়ন কক্ষে কুকুর পালন এবং কুকুরের সাথে দৃষ্টিকটু সখ্যতা ইত্যাদি অপসংস্কৃতি এখন আমাদের নগর জীবনে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ছে।

মোটকথা, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিতে যে সর্বগ্রাসী বিপর্যয় নেমে এসেছে তা দীনীমূল্যবোধের অধিকারী বিবেকবান ব্যক্তির অন্তরে নাড়া না দিয়ে পারে না।

শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ ও বিবেকবান দায়িত্বশীলগণের করণীয়

এমতাবস্থায় দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ ও অন্যান্য বিবেকবান দায়িত্বশীলগণ যদি এখনই পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ান এবং আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ না হন তাহলে এ অসভ্যতা ক্রমান্বয়ে পুরো জাতিকে গ্রাস করে ফেলবে। কারণ, শহরে যে সংস্কৃতির চর্চা হয় খুব দ্রুত তা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। শিশু-কিশোর, পৌঢ়-যুবক, আবাল-বৃদ্ধ কেউ তার অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

সুতরাং আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অপসংস্কৃতি আর অসভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছে তা রোধ করতে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আমরা যেন সকল অপসংস্কৃতির বেড়াজাল ছিন্ন করে যথার্থ ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হই এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করি এটাই হোক প্রতিটি নববর্ষের আন্তরিক কামনা।

লেখক: প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস,
জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুন নূর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
খতীব, ওয়ারলেস গেইট চৌরাস্তা জামে মসজিদ
মগবাজার, ঢাকা।

সালাতুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি পর্যালোচনা

- মাওলানা সাঈদুয্যামান -

ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ নির্বিচারে যে কোন ধর্মীয় বইয়ের প্রতিই অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ রাখেন। এ দেশের মুসলমান আরবীতে লিখিত বিনোদন-পত্রিকাও ভক্তিভরে চুমু খান। আর নামায-কালাম সম্বন্ধীয় হলে তো বুকেই জড়িয়ে নেন। তাদের স্বভাব-সরলতা সে সব পুস্তকের গুণাগুণ ও মান মূল্যায়নে সময় ব্যয় করতে বিলকুল নারায। এ সুযোগে কতিপয় খাদেমীনে ইসলাম (!) তাদের হাতে নামসর্বস্ব কিছু ইসলামী বই-পুস্তক গুঁজে দিচ্ছেন। যা পাঠ করে সাদাদিল মুসলমান প্রতিনিয়ত পথবিচ্যুত হচ্ছেন।

প্রিয় পাঠক! এমনই একটি বইয়ের সঙ্গে আজ আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব। নাম, *ছালাতুর রাসূল* (রাসূলের নামায) লেখক, ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব।

লেখক ও কিতাব পরিচিতি

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা জেলার বুলারাটি গ্রামে ড.গালিব সাহেবের জন্ম। তার পিতা মাওলানা আহমদ আলী ছিলেন তৎকালীন 'আহলে হাদীস' দলের একজন নেতা। ড. গালিব সাহেব আলিয়া মাদরাসায় দাখিল, আলিম, ফাযিল এবং কামিল পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিভাগে এমএ ডিগ্রি নেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'আহলে হাদীস আন্দোলন আদি ও উন্নয়ন' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

ছালাতুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

প্রিয় পাঠক! কোন দীনী গ্রন্থ রচনার জন্য লেখকের মধ্যে অন্তত তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। (১) ইলমী আমানতদারী তথা দীনী বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পূর্ণ বিশ্বস্ততা (২) توافر الصلاحية (যোগ্যতার পরিপূর্ণতা) (৩) توافر المواد (সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও বিস্তৃত তথ্যের উপস্থিতি ও অবগতি)। এগুলোর কোন একটি অসম্পূর্ণ কিংবা ত্রুটিযুক্ত হলে পুরো বিষয়টিতে তার প্রভাব পড়ে। ডক্টর সাহেব তার বইটিতে মুসলিম জনসাধারণকে হাদীসের আলোকে নামায শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। সঙ্গে তিনি নামাযের প্রয়োজনীয় মাসাইল ও কুরআনুল কারীমের কিছু সূরা ইত্যাদি যোগ করেছেন। কিন্তু উল্লিখিত তিন গুণের অনুপস্থিতির কারণে পুরো কিতাবটিতেই বিভিন্ন প্রকারের অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল–

ড. সাহেব ছালাতুর রাসূল কিতাবের ৫৩ নং পৃষ্ঠায় 'সালাত বিনষ্টের কারণসমূহ' শিরোনামের ৫নং ধারায় লেখেন, <u>ছালাতে অধিক হাস্য করা।</u>

প্রকাশ থাকে যে, যে হাসি দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় হাদীস শরীফে قهقهة শব্দ দ্বারা তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ড. সাহেব এখানে قهقهة এর অর্থ করেছেন 'অধিক হাস্য'। প্রশ্ন হল قهقهة শব্দ দ্বারা অধিক হাস্য উদ্দেশ্য না কি সশব্দ হাসি উদ্দেশ্য? ডক্টর সাহেব এর অনুবাদ করতে গিয়ে শব্দচয়নে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। কারণ অধিক হাস্য আর সশব্দ হাসি দু'টি ভিন্ন জিনিস। আরবীতে 'অধিক হাস্য' বোঝাতে ضحك كثير শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আর 'সশব্দ হাসি' বোঝাতে قهقهة শব্দটি। যেমন কেউ যদি পুরো নামাযেই মুচকি হাসে তাহলে নামাযে 'অধিক হাস্য' পাওয়া গেল, কিন্তু এতে কি তার নামায নষ্ট হবে? হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ শব্দ করে অল্প হাসে তাহলে কি তার নামায ঠিক থাকবে? থাকবে না। বোঝা গেল, قهقهة শব্দের অনুবাদ 'অধিক হাস্য' করা ভুল। ডক্টর সাহেবের অনুবাদটি সাধারণের চোখে মানিয়ে গেলেও বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে তা হাদীসের মূল ভাষ্যের চরম বিকৃতি বৈ কিছুই নয়।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত দৃষ্টান্তে আমরা ড. সাহেবের যোগ্যতার অবস্থান নির্ণয় করতে পারি এবং মৌলিক তিন গুণের দ্বিতীয়টি অর্থাৎ توافر الصلاحية এর অনুপস্থিতি স্পষ্ট বুঝতে পারি। বইটি থেকে এমন অনেক বিষয় বিজ্ঞ পাঠক নিজেও বের করতে পারবেন।

মূলত আহলে হাদীস বা গাইরে মুকাল্লিদগণের বক্তব্য ও গ্রন্থাবলীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ বিষয়টি উপলব্ধ হয় যে, তারা কোন নিয়ম-নীতির অনুসারী নয়; বরং শুধুমাত্র আত্মপূজারী। তাদের উদ্দেশ্য হল উম্মতের মাঝে ঐক্যের নামে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং এর দ্বারা বৃটিশদের কৌশল (You Fight We Rule) সফল করা। তাদের না আছে সুনির্দিষ্ট কোন মাযহাব। তাইতো তাদেরকে লা মাযহাবী বলে আখ্যায়িত করা হয়। পক্ষান্তরে আহলে হকদের 'চার মাযহাব' শরঈ নীতিমালার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মাযহাবেরই নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা রয়েছে, যেগুলোকে 'উসূলুল ফিক্‌হ' বা 'ফিক্‌হ শাস্ত্রের নিয়মনীতি' বলা হয়। এ চার মাযহাবের একটি মৌলিক নীতি হল, যেখানে যে আমল সাহাবায়ে কেরামের পরম্পরায় চলমান, সেখানে সে আমলকে প্রধান্য দেয়া। যেমন, ইমাম মালেক রহ. এর নিকট তৎকালীন আমীর সারা মুসলিম জাহানে তাঁর রচিত মুআত্তা অনুযায়ী ফয়সালা জারি করার বিষয়ে পরামর্শ চাইলে তিনি তাতে বাধা দেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীকে সে এলাকার সাহাবায়ে কেরামের পরম্পরায় চলমান আমলের উপর বহাল রাখার পরামর্শ দেন।

কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীস ভাইদের অভ্যাস সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি উম্মাহর মাঝে দলীল-সমৃদ্ধ কোন আমল চালু থাকে এবং সে আমল আদায়ের বিভিন্ন পন্থা থাকে, তাহলে তারা প্রচলিত পন্থা বাদ দিয়ে ভিন্ন একটি পদ্ধতিকে এমনভাবে পেশ করেন যেন সে পন্থাটাই সঠিক। আর উম্মাহর মাঝে প্রচলিত পন্থাটি গোমরাহী বা ভুল। ডক্টর সাহেবের বই থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। তিনি শুরুতেই ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম লেখেন। এতে তাকবীরে তাহরীমার পর পঠিত দু'আটি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লেখেন, <u>বিনম্র চিত্তে নিম্নোক্ত দু'আর মাধ্যমে মুসল্লী তার সর্বোত্তম ইবাদতের শুভ সূচনা করবে।</u>

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬)

আজব ব্যাপার হল, পাকিস্তানের আহলে হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ সাদেক

সিয়ালকোটী তার *ছালাতুর রাসূল* কিতাবে তাকবীরে তাহরীমার পর হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত দু'আ এবং আমাদের দেশে ছানা হিসেবে প্রচলিত মাসূর দু'আ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك উভয়টির কথাই বলেছেন। তো দেখা যাচ্ছে তাকবীরে তাহরীমার পর দু'আ সম্পর্কে স্বয়ং আহলে হাদীস আলেমগণ পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দেন। কিন্তু ডক্টর সাহেব এ জায়গায় কেবল এমন একটি দুআ উল্লেখ করলেন, যা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ জানেও না। আর অপর প্রসিদ্ধ দুআটি তিনি বেমালুম চেপে গেলেন এবং তা পড়তে অসুবিধা কোথায় তাও তিনি বললেন না। তাহলে কি ছানা হিসেবে প্রসিদ্ধ দু'আটি হাদীসে বর্ণিত নেই? অথচ আমরা বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ দু'আর বর্ণনা পাই।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلوة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

অর্থ: রাসূলুল্লাহ যখন নামায পড়তেন তখন বলতেন, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৮৯৯, ৯০০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৪২, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৮০৪) হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী রহ. উল্লিখিত হাদীসের পর বলেন,

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم

অর্থ : তাবেয়ীন ও অন্যান্য অধিকাংশ আলেমগণের আমল হল এই ছানা পাঠ করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا افتتحنا الصلوة ان نقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك وكان عمر يعلمنا ويقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমরা যখন নামায শুরু করব তখন যেন سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك বলি। আর উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-ও এমনটি করতেন। তিনি আমাদেরকে শিখাতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এভাবে ছানা বলতেন। (তাবারানী আল আউসাত; হা.নং ১০২৬)

ইমাম মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া রহ. তাঁর *মুনতাকাল আখবার* গ্রন্থে লেখেন,

وجهربه أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس من ان السنة إخفاءه. وهذا يدل على انه الأفضل وانه الذى كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم غالبا.

অর্থ : হযরত উমর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে কখনো কখনো মানুষকে শেখাবার জন্য উচ্চস্বরে এই ছানা পাঠ করতেন। অথচ সুন্নাত হল ছানা অনুচ্চস্বরে পড়া। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামাযে এ ছানা পড়াই উত্তম এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এ ছানাই পাঠ করতেন।

হযরত আয়েশা, আনাস ও আবদা রাযি. থেকেও এরূপ বর্ণিত।

প্রিয় পাঠক! যুগযুগ ধরে সাধারণ মানুষের মাঝে যে আমল প্রচলিত, যার পক্ষে এতগুলো সহীহ হাদীস ও আছার রয়েছে। এমন সুদৃঢ় দলীলের বিপরীতে *সহীহ বুখারী*, *সহীহ মুসলিম*-এ আরেকটি দু'আ থাকার কারণে এ দু'আটিকে এড়িয়ে যাওয়া ইলমী খিয়ানত নয় কি? এটি হল তাদের ইলমী খিয়ানতের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত। তাদের রচিত বই-পত্রে এ রকম ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন 'দু'আয়ে কুনূত', 'ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর' ইত্যাদি। প্রিয় পাঠক! অধিকাংশ আহলে হাদীসদের ইলমী বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও বিস্তৃত তথ্যের উপস্থিতি ও অবগতি থাকে না। ফলে তারা বিভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় তাদের মতের বিপরীত আমলকারীর দলীলকে নির্বিচারে ভিত্তিহীন ও যঈফ বলে দেয়। আবার কখনো ইলমী খিয়ানতও এ হীন কর্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন,

আমীন প্রসঙ্গ

ডক্টর সাহেব ১০৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আমীন বলার পক্ষে সতেরটি হাদীস এসেছে। যার মধ্যে আমীন আস্তে বলার পক্ষে শো'বা থেকে একটি রেওয়ায়াত *আহমদ* ও *দারা কুত্বনী*তে এসেছে, خفض او أخفى بها صوته যার অর্থ, আওয়াজ নিম্নস্বরে হত। একই রেওয়ায়াতে সুফিয়ান ছাওরী থেকে এসেছে رفع بها صوته যার অর্থ, আওয়াজ উচ্চস্বরে হত। হাদীস বিশারদ পণ্ডিতগণের নিকটে শো'বা থেকে বর্ণিত নিম্নস্বরে আমীন বলার হাদীসটি মুযতারিব (مضطرب) অর্থাৎ যার সনদ ও মতনে নাম ও শব্দগত ভুল থাকার কারণে যঈফ।' অর্থাৎ তিনি উচ্চস্বরে আমিন বলার পক্ষে সুফিয়ান ছাওরীর রিওয়ায়াতটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন হল, মুযতারিব কাকে বলে? যে হাদীসের اضطراب এর কোন সমাধান করা যায় না তাকে مضطرب বলা হয়। অথচ অন্যান্য ইমামগণ এখানে اضطراب বা অস্পষ্টতার নিরসন করেছেন। যার দ্বারা শো'বা রহ. এর বর্ণনার সনদ ও মতনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

অপরদিকে সুফিয়ান ছাওরীর বর্ণনা– ডক্টর সাহেব যেটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন– স্বয়ং সুফিয়ান ছাওরীও দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। কারণ সুফিয়ান ছাওরী নিজেই এ হাদীসের উপর আমল করতেন না। ইবনে হাযাম যাহেরী তার *আল মুহাল্লা* নামক কিতাবে (২/২৮০) ছুফিয়ান সাওরীর এ বিষয়টি সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু হযরত উমর ফারুক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يخفي الإمام اربعا التعوذ، بسم الله الرحمن الرحيم و آمين و ربنا لك الحمد.

অর্থ : ইমাম চারটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে তথা আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ। (আল মুহাল্লা ২/২৮০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

يخفي الإمام الإستعاذة و بسم الله الرحمن الرحيم و آمين.

অর্থ : ইমাম তিনটি বথা নিঃশব্দে বলবে তথা আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমীন। (আল মুহাল্লা ২/২৮০)

এমনিভাবে *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা* (৪১৪৯) ও *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক*-এ (২৫৯৭) ইবরাহীম নাখঈ থেকেও সমর্থনে উক্তি রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. (মৃত্যু ৩১১হি.) –যিনি হানাফী ইমাম নন– তাঁর কিতাব *তাহযীবুল আছার*-এ এক চমৎকার কথা বলেছেন,

والصواب ان الخبر بالجهر بها والمخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وإن كنت مختارا خفض الصوت بها إذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك.

অর্থ : সঠিক কথা হল, আমীন আস্তে বলা ও জোরে বলার উভয় হাদীসই সহীহ এবং দু'টি পন্থা অনুযায়ী একেক জামাআত আলেম আমল করেছেন। তবে আমি আস্তে আমীন বলাই অবলম্বন

করি, কেননা অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এ অনুযায়ী আমল করতেন। (আল জাওহারুন নাকী ২/৫৮)

এত সুদৃঢ় আমল থাকা সত্ত্বেও আহলে হাদীস বন্ধুরা কীভাবে আস্তে আমীন বলাকে যঈফ বলে তা বোধগম্য নয়। এটা হয়ত জ্ঞানের গভীরতার অভাব নতুবা ইলমী খিয়ানতের প্রভাব। এর আরো দৃষ্টান্ত আছে। যেমন রফউল ইয়াদাইন ও বুকে হাত বাধার মাসআলা ইত্যাদি।

প্রিয় পাঠক! তাদের চক্রান্তের এক বিশেষ কৌশল হল, হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করা।

দৃষ্টান্ত-১ : নামাযে হাত বাঁধা সম্পর্কে ডক্টর সাহেব ৮৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন, অতঃপর বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বেধে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্মুখে নিবেদিত চিত্তে সিজদার স্থান বরাবর দৃষ্টি রেখে দণ্ডায়মান হবে। এর কয়েক লাইন পর তিনি বলেন, এ কথা স্পষ্ট যে, বাম হাতের উপর ডান হাত রাখলে তা বুকের উপরই চলে আসে।

উল্লিখিত বক্তব্যকে হাদীসের অপব্যাখ্যা না বলে উপায় নেই। আজ বহু সাধারণ আহলে হাদীস ভাই এ অপব্যাখ্যার শিকার। আফসোসের বিষয়! শুধু *সহীহ বুখারী*তে ذراع শব্দটি পেয়ে এবং শুধু তার আভিধানিক অর্থের ওপর নির্ভর করে এভাবে হাত বাঁধার তালীম দেয়া মূলত হাদীস মানার নামে হাদীস বর্জন করা এবং উম্মতকে ধোঁকা দেয়া।

*সহীহ বুখারী*র এ বর্ণনার ব্যাখ্যায় *সহীহ বুখারী*র ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. *ফতহুল বারী*তে বলেন,

ابهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند ابي داؤد والنسائى ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وصححه ابن خزيمة وغيره

অর্থ : বাহু কোন জায়গায় রাখতেন সেটা এই হাদীসে অস্পষ্ট। *আবূ দাউদ* ও *নাসাঈ শরীফ*-এ ওয়ায়েল রাযি.-এর সূত্রে হাদীসে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তিনি তার ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন'। ইবনে খুযাইমা প্রমুখ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা শাওকানী রহ. তার কিতাব *নাইলুল আউতারে*ও এমনটি বলেছেন। দেখুন (২/১৮৭)

পাঠক! চার মাযহাবের কোন মাযহাবেই ডক্টর সাহেবের ব্যাখ্যানুযায়ী হাত বাঁধার কথা নেই। অথচ তিনি এবং তার অনুগামী লা-মাযহাবী ও গাইরে মুকাল্লিদরা এই আমলকে হাদীস অনুসরণের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন।

দৃষ্টান্ত-২ : ডক্টর সাহেব বলেন, 'পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। ছালাতে নারীরা পুরুষের অনুগামী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা সেভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।

এটা হাদীস শরীফের সরল অনুবাদ। কিন্তু এর মর্ম বুঝতে ডক্টর সাহেব ভুল করেছেন। কারণ সর্বদা সর্বস্থানে সম্বোধন সূচক শব্দকে ব্যাপক মনে করা সঠিক নয়। শরঈ বিধি-বিধানের পর্যবেক্ষণে এটা-ই বুঝে আসে। এমন বহু মাসআলা পাওয়া যাবে যেখানে ব্যাপক সম্বোধন সত্ত্বেও মহিলাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন হজ্জের কিছু মাসাইলই ধরা যাক।

উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের হুকুম ভিন্ন (তারা নিম্নস্বরে পড়বে)।

তাওয়াফের সময় রমলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের হুকুম ভিন্ন (তারা রমল করবে না)।

এমনিভাবে সাঈ'র মাসআলাতেও একই হুকুম। এই ভিন্নতার দু'টি সূরত হতে পারে।

কখনো ব্যাপক সম্বোধনের পর মহিলাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন ইয়াযিদ ইবনে আবি হাবীব রহ. বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان. فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل

অর্থ : একবার রাসূলুল্লাহ নামাযরত দুইজন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর জমীনের সাথে মিলিয়ে দেবে। কেননা মহিলারা এক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়। (কিতাবুল মারাসীল, আবূ দাউদ; হা.নং ৮০)

প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস নেতা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান *সহীহ বুখারী*র ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আউনুল বারী*তে (১/৫২০) লেখেন, উল্লিখিত হাদীসটি সকল ইমামের উসূল অনুযায়ী দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য। মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী *সুবুলুস সালাম শরহু বুলূগুল মারাম*-এ এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সিজদার মাঝে পার্থক্য করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر اليها ويقول يا ملائكتي! أشهدكم أني قد غفرت لها.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন (ডান) উরুর উপর উরু রাখে। আর যখন সিজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখে (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে) বলেন, 'হে আমার ফেরেশতারা! সাক্ষী থাকো আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। (সুনানে কুব্‌রা, বাইহাকী ২/২২৩) এ হাদীসটি হাসান।

এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও মহিলাদের নামাযের বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন আমল বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী রাযি. বলেন,

إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها

অর্থ : মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৮, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ২/৩০৮, সুনানে কুব্‌রা, বাইহাকী ২/২২২)

এমনিভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ, ইবনে জুরাইজ, মুজাহিদ ইবনে জাব্‌র, যুহরী, ইবরাহীম নাখঈ, হাসান বসরী ও কাতাদা প্রমুখ ইমামদের থেকেও মহিলাদের নামাযের ভিন্নতার বর্ণনা প্রমাণিত। এ কারণেই মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামদের নিকটও মহিলাদের নামাযের ভিন্নতা রয়েছে।

উপরোল্লিখিত হাদীস এবং আছারে আমরা পুরুষদের নামাযের চেয়ে মহিলাদের নামাযে ভিন্নতার চিত্র সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই, যেখানে মহিলার সতরের ব্যাপারে খুবই লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

আবার কখনো মহিলাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন করে নির্দেশ দেয়া না হলেও মৌলিকভাবে ভিন্নতা থাকে। যেমন মহিলাদের নামাযে সিজদা এবং বৈঠক ছাড়া অন্যান্য আমলগুলো।

(২১ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

থার্টিফাস্ট নাইট উদযাপন : পাশ্চাত্যের নগ্ন অনুকরণ

মুফতী জহিরুল ইসলাম

নববর্ষের সূচনাতে আল্লাহ প্রেমিক মুমিনের অনুভূতি

জানুয়ারী-'১৫ থেকে একটি নতুন সৌরবর্ষের সূচনা হতে যাচ্ছে। একটি বছরের সমাপ্তি এবং আরেকটি বছরের সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে একজন ঈমানদার বান্দার অনুভূতি কী হওয়া উচিত? আনন্দের না বেদনার, চিন্তার না গাফলতের? তার তো চিন্তা হওয়া উচিত, আমার নওরোজ হল প্রতিদিন। প্রতিদিনের ভোর আমাকে দান করে মহান রাব্বুল আলামীনের শোকর গোযারীর প্রেরণা, একটি নতুন দিবসের উদ্দীপনা এবং জীবনসন্ধ্যার প্রস্তুতির চেতনা। সুতরাং বর্ষপঞ্জির একটি বা দু'টি দিন নয়, জীবনের প্রতিটি দিনই মুমিনের উৎসবের দিন।

সে ভাববে, যে দিনগুলো শেষ হয়ে গেল তা তো আমার জীবনেরই একটি অংশ। আজ আমার জীবনের একটি ক্যালেন্ডার শেষ হয়ে গেল। হায়! গত ৩৫৬ দিনে আমার জীবনপ্রাসাদ থেকে ৩৬৫টি ইট খসে পড়ল। হায়! আমার জীবন তো ছোট হয়ে এলো। এ-তো আমার আনন্দের বিষয় নয়, চিন্তার ব্যাপার; নিজের হিসেব নিজে নেয়ার ব্যাপার। হায়! জীবনের একটি বছর আমি কীভাবে কাটালাম? কোন গাফলতে আমার পরম পুঁজি নষ্ট করলাম? যে উদ্দেশ্যে আমাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে তার কী বিহিত করলাম? তো এটা হল এ জাতীয় বিষয়ের হিসেব মেলানোর সময়।

মুমিনের সংকল্প

একটি বছরের উপসংহারে দাঁড়িয়ে, একটি বছরের সর্বশেষ দিনের সাক্ষী হয়ে একজন আল্লাহ প্রেমিক মুমিনের অন্তরে এ প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হওয়া দরকার, আর সংকল্প ও পরিকল্পনা করা দরকার যে, আগামী বছর সে কিভাবে কাটাবে? এবারের ব্যর্থতাকে কিভাবে সাফল্যে পরিণত করবে? জীবন সংগ্রামের বন্ধুর পথে কিভাবে মঞ্জিলে পৌঁছবে? কাজেই উদ্দেশ্য ও গন্তব্য বিস্মৃত ব্যক্তি যেভাবে নতুন ভোরের কল্পনায় আনন্দিত হয়, নতুন প্রভাতে নতুন সূর্যোদয় দেখার প্রতীক্ষায় থাকে, খোদার পথের পথিক তো সেভাবে নতুন ভোর দেখার জন্য রাত জেগে অপেক্ষা করতে পারে না। বছর শেষে নতুন আরেকটি বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য সে রং তামাশা আর আনন্দ উল্লাস করতে পারে না। সে তো নিজেকে প্রশ্ন করবে, আমি কোথা হতে এসেছি? কেন এসেছি? কী করছি আর যাব কোথায়?

আমলনামার ব্যালেন্সশীট তৈরি করা

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে,

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على حاسب نفسه في الدنيا.

অর্থ : হিসাব চাওয়ার পূর্বে নিজের হিসাব করে নাও। তোমরা কাজের পরিমাপ করার পূর্বেই তুমি নিজের কাজের পরিমাপ করে নাও। (সুনানে তিরমিযী; ৪/৬৩৮)

এ হাদীসের মর্মার্থ হল, হে মানুষেরা! একটু পরেই তোমাদের হিসাব শুরু হয়ে যাবে। তখন পূর্ণ হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে। কাজেই হিসাব নেয়ার পূর্বেই তুমি তোমার ব্যালেন্সশীট তৈরি করে রাখ। আজকের এই দিনে একজন মুমিন হিসেবে আমার আমলনামার ব্যালেন্সশীট তৈরি করা দরকার। একটি মোমবাতি যেমন তিলে তিলে ছোট হতে হতে শেষ হয়ে যায় তেমনি দিনের আগমন ও রাতের প্রস্থানে আমাদের জীবনের মোমবাতিটি ছোট হতে হতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের জীবন আমরা কিভাবে ব্যয় করছি তার হিসাব আমাদেরকে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ.

অর্থ : মানুষের হিসাবের সময় তো খুব নিকটেই। অথচ তারা গাফলতিতে ডুবে বিমুখ হয়ে আছে। (সূরা আম্বিয়া-১)

প্রিয় বন্ধু! মহাকালের তুলনায় তোমার আমার ৬০/৭০ বছর কিছুই না। বিন্দু বা কণার মত দেখাও যাবে না। তাই আমাদের জীবনের হিসাবের সময় অতি নিকটে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من مات فقد قامت قيامته.

অর্থ : যে ব্যক্তি মারা গেছে তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে। (তাফসীরে কুরতুবী ১৯/১৮৮)

আল্লাহর ওলীগণ প্রতিদিন আমলের হিসাব নেন

আমার মৃত্যু কখন হবে? তাতো আমি জানি না! তাই এখনই হিসাব কষে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। এ জন্যই আল্লাহর ওলীগণ প্রতিদিন নিজের হিসাব গ্রহণ করতেন।

'হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আল্লাহর ওলীর মর্যাদা আপনি কিভাবে লাভ করেছেন? তিনি বলেছিলেন, ত্রিশ বছর পর্যন্ত প্রতি রাতে নিজের আমলের হিসাব নিয়েছি। এই হিসাব নেয়ার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। (প্রাগুক্ত)

এটাকেই বলা হয় 'মুহাসাবা' বা নিজের হিসাব গ্রহণ। বছর শেষে তাই হিসাব নিতে হবে, ভালো কাজে আমি কতটুকু অগ্রসর হলাম? ন্যায়ের পথে আমি কতটুকু অবদান রাখলাম?

আল্লাহর ওলীগণ নিজের মনকে ডেকে বলেন, হে মন! কিভাবে তোমার আনন্দ, উল্লাস করতে ইচ্ছে হয়? কত মানুষের লাশ না তুমি দেখেছো! কত কাফনাবৃত শবদেহ না তুমি অবলোকন করেছো! হে আত্মা! তোমার কি মনে হয় না, তোমাকে একদিন এই জানাযার খাটে উঠতে হবে? হে পাষাণ! এত লাশ দেখেও, এত কবর দেখেও তোমার সম্বিৎ ফিরে না যে, এই মাটির নিচে তোমাকেও একদিন যেতে হবে? অন্ধকার, নির্জনতা, একাকিত্ব আর কীট-পতঙ্গের ঘরে তোমাকেও একদিন শুতে হবে? তাহলে থার্টিফাস্ট নাইটে তোমার কেন এত উন্মাদনা? তুমি কি চাও এই উন্মাদনার মধ্যেই তোমার কাছে মালাকুল মউত চলে আসুক? না কি এ গ্যারান্টি আছে, মালাকুল মউত এ সময় তোমার কাছে আসবে না?

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেছেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের অপেক্ষা করো না। আর সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। সুস্থাবস্থায় অসুস্থ সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে নাও। হে আল্লাহর বান্দা! তোমার জানা নেই কাল তোমার কী অবস্থা হবে? (সুনানে তিরমিযী; ৪/৫৬৮)

বাংলাদেশে থার্টিফাস্ট নাইট উদযাপন

পাশ্চাত্যে থার্টিফাস্ট নাইটে আনন্দ, ফুর্তি ও জাঁকজমকের সাথে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করা হয়। বিজাতীয় এ হাওয়া এখন আমাদের গায়েও লেগেছে। গত

কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটার পর থেকে এ রাত উদযাপন উপলক্ষে হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। নাইট ক্লাব, গেস্ট হাউজ, অফিসার্স ক্লাব ও লেডিস ক্লাবগুলো উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ তরুণ-তরুণীর নাচ-গানে জাহান্নাম হয়ে ওঠে। সেই সাথে শুরু হয় বিয়ার, হুইস্কি, ফেন্সিডিল, আফিম, হেরোইন, ইয়াবা, গাজাসহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য সেবনের মহাধুম। এ সময় তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় যৌন উন্মাদনা। ধীরে ধীরে ক্লাব,সেমিনার আর পার্কগুলো পরিণত হয় ভাসমান পতিতালয়ে। এভাবে প্রতি বছর এক রাতে কত নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আজ বর্ষ উদযাপনের নামে যে বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়া হচ্ছে এবং বেহায়া-বেলেল্লাপনার প্রসার ঘটানো হচ্ছে তার পরিণতি কী দাঁড়াচ্ছে তা কি কখনো ভেবে দেখেছি? এ রাতে রাস্তাঘাটে মদের বোতল আর নারী নিয়ে প্রকাশ্যে যেসব নোংরা কর্মকাণ্ড ঘটানো হয় মিডিয়ার কল্যাণে তার চিত্র প্রত্যক্ষ করে বিবেকবান কোন মুমিন শিহরিত না হয়ে পারে?

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, বাংলাদেশের মত একটি বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্রে থার্টিফাস্ট নাইটে তরুণ-তরুণীদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ, র‍্যাব নিযুক্ত করতে হয়। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী হোটেল রূপসী বাংলায়, সোনারগাঁওয়ে ও অন্যান্য অভিজাত হোটেলগুলোতে থার্টিফাস্ট নাইট উদযাপনের জন্য চড়া দামে টিকেট বিক্রি করা হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর টিকেটের দাম অনেক চড়া। কারণ, তারা জানে দাম যতই হোক 'সাপ্লাই' পর্যাপ্ত হলে কাস্টমারের অভাব হবে না, তাদের বিনিয়োগ বিফলে যাবে না। প্রশ্ন হল, এসব হোটেলে রাত্রি যাপনের জন্য, ঐ নোংরা আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য কি বিদেশ থেকে লোকজন আসবে? শুধু বিধর্মীরাই কি যাবে ঐ হোটেলগুলোতে? আফসোস! এ দেশে এমনও মুসলমান আছেন যারা এই একটি রাত উদযাপনের জন্য হাজার, লক্ষ টাকা ধ্বংস করবেন। সারারাত নেশায় বুদ হয়ে নৃত্য-গীত উপভোগ করবেন এবং আকণ্ঠ পাপে ডুবে থাকবেন।

২০০০ খ্রিস্টাব্দের থার্টিফাস্ট নাইটের কথা কি মনে পড়ে? সেবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাঁধন নামের এক ছাত্রীকে রীতিমত দিগম্বর করে ফেলা হয়েছিল! মিডিয়ার মারফতে সারা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল আমাদের জাতীয় অধঃপতনের সে কদর্য দৃশ্য। এ ঘটনায় শুধু একটি মেয়েকেই কলঙ্কিত করা হয়নি; এ কলঙ্ক ছিল সমস্ত বাংলাদেশী মুসলমানের। আমাদের যে ছবি বহির্বিশ্বে সেদিন প্রচারিত হয়েছে তা ছিল এ দেশের ষোল কোটি মানুষের জন্য যুগপৎ লজ্জা ও অপমানের।

ভাবতে অবাক লাগে, এ কলঙ্কের জন্মদাতারা কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ছিল না, তারা ছিল দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দ। যারা কদিন পর দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিবে, ক্ষমতা ও প্রশাসনের চেয়ারগুলো অলঙ্কৃত করবে– এ ছিল তাদের আচরণ।

বস্তুত কোন মুসলমান নর-নারী থার্টিফাস্ট নাইট উদযাপনের জন্য হোটেল সোনারগাঁও আর রূপসী বাংলায় যেতে পারে না। কোন কনসার্টে এবং গান-বাজনায় অংশ নিতে পারে না। যার অন্তরে ঈমানের সামান্য আলোও আছে থার্টিফাস্ট নাইট তার জন্য নয়। তাদের এই দিন উল্লাসের নয়। এই দিন তাদের হিসাব-নিকাশের দিন। আল্লাহকে যারা ভয় করে নতুন বছরের সূচনায় তারা নিজেদের আমলের দফতর খুলে হিসাব নিবে। মন্দ কাজের জন্য নিজেকে তিরস্কার করবে আর সৎ কাজে মনোযোগী হওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে।

থার্টিফাস্ট নাইট বিজাতীয় উৎসব

থার্টিফাস্ট নাইট মুসলমানদের উৎসব নয়; আমদানীকৃত বিজাতীয় কালচার। আর বিজাতীয় উৎসবে যারা অংশগ্রহণ করবে তারা তাদেরই দলভুক্ত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটিকে এভাবে বলেছেন,

من تشبه بقوم فهو منهم.

অর্থ : যে অন্য জাতির আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুকরণ করবে (পরিণামে) সে তাদেরই একজন বিবেচিত হবে। (সুনানে আবু দাউদ)

আমরা তো মুসলমান। থার্টিফাস্ট নাইট উদযাপন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিজাতীয় প্রথার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। এ ধরনের নববর্ষ বা বর্ষপূর্তি উদযাপনের এমনকি জন্ম বার্ষিকী বা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করারও কোন বিধান ইসলামে নেই। ইসলাম এমন রুচিহীন, অর্থহীন ও বল্গাহীন আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষাই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। সকল কাজে ইসলামের নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও স্বতন্ত্র পথ-পদ্ধতি রয়েছে। সুস্থ, সুন্দর, গাম্ভীর্যপূর্ণ তাহজীব-তামাদ্দুন ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইসলামী আচার-আচরণ ছেড়ে এসব জাহান্নামী আয়োজন কখনো কোন মুসলমান কল্পনা করতে পারে না। প্রগতিবাদী নামক দুর্গতিবাদীদের ষড়যন্ত্রে বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারে একজন খোদা প্রেমিক মুমিন অভ্যস্ত হতে পারে না।

কিন্তু বর্তমানে ইসলামের কালেমায় দীক্ষিত ব্যক্তিদেরকেই নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানে বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি, তাদের অভ্যাস ও নীতি-নৈতিকতা অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছর থার্টিফাস্ট নাইটে আমাদের দেশে যেসব কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে তার সাথে মুসলমানিত্বের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সময় এ দেশের মুসলমান যেভাবে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মেতে ওঠে তাতে এটা যে একটা মুসলিম রাষ্ট্র তা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। সে রাতের মাতলামী কেবল পাশ্চাত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুঃখের সাথে বলতে হয়, এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান। ইসলামী সংস্কৃতি এ জাতির হাজার বছরের লালিত ধন। আলেম-উলামা ও বুযুর্গানে দীনের চোখের পানিতে এ অঞ্চলের ভূমি সিক্ত-সজীব। একটি জাতির আবহমান কালের আচরিত সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য থেকে বয়ে আনা নোংরা আচার অনুষ্ঠানকে গোটা জাতির কাঁধে চাপিয়ে দেয়া কখনোই সঙ্গত হতে পারে না।

তথাকথিত আধুনিক শ্রেণীর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ

'আধুনিক' পরিচয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধকারী মুসলমান আজ ইসলামের আলোকময় সভ্যতা পরিহার করে বিকৃত পাশ্চাত্যকে নিজেদের জীবনে ধারণ করেছে। নির্বিচার পরানুকরণের ফলে এদের বোধশক্তি ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। এদের বিবেক-বোধের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। ক্রমেই তারা যেন অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তা অনুভবও করতে পারছেন না। অবশ্য পরিবেশ, সামাজিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অবচেতন মনেও কেউ কেউ বিকৃত সভ্যতার অনুকরণে জড়িয়ে পড়ছেন। এ দেশের মুসলিম তরুণ-তরুণীদের অধিকাংশ এভাবেই পরানুকরণের শিকার হচ্ছেন। নির্বিচারে অনুকরণ প্রবণতার সবচেয়ে ক্ষতির দিকটি হল, এতে একটি জাতি তার স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলে। **(৩০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ঈমান-আকাইদ

আব্দুল্লাহ
কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

৫৫ প্রশ্ন : 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে।' এই হাদীসের ভিত্তিতে যে সকল মুসলমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধর্মীদের অনুসরণ করে থাকে তারা কি কাফের?

উত্তর : বিধর্মীদের কিছু রীতি-নীতি আছে ধর্মীয় আর কিছু আছে জাগতিক ও সামাজিক। কোনো মুসলমান যদি স্বেচ্ছায় বিধর্মীদের ধর্মীয় শি'আর (নিদর্শন) বা রীতি-নীতির অনুসরণ করে যেমন, পৈতা পরিধান করা, ক্রুশ চিহ্ন ধারণ করা, কপালে সিঁদুর লাগানো, হাতে শাঁখা পরিধান করা ইত্যাদি। তাহলে তার এই কাজগুলো কুফুরী হবে এবং এর দ্বারা তার ঈমান চলে যাবে। এ ক্ষেত্রে তার কাফেরদের দলভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

আর যদি কেউ বিধর্মীদের জাগতিক ও সামাজিক এমন সব রীতি-নীতি এবং রসম-রেওয়াজের অনুসরণ করে যেগুলো তাদের ধর্মীয় নির্দশনের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেক্ষেত্রে কুফুরী হবে না। তবে কবীরা গুনাহ হবে। যেমন, দাড়ি মুণ্ডানো, জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, নববর্ষ পালন এবং লেবাস-পোশাক ও আচার-ব্যবহারে তাদেরকে অনুসরণ করা।

এ জাতীয় কাজ কোনো মুসলমান করলে তাকে কাফের বলা যাবে না। কিন্তু কাফেরদের মত কাজ করায় পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে বা আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় তাকে ক্ষমা না করেন। (সূরা মায়েদা-৫১, আউনুল মা'বূদ ১১/৫১, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া, হিন্দিয়ার টীকা ৬/৩৩২, মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১২/৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/৩৪০, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/২৮৫)

সালিমা
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

৫৬ প্রশ্ন : আমার এক নিকট আত্মীয়ার স্বামীর দাড়ি আছে। আমার সেই আত্মীয়া তার ভাবীর কাছে বলেছে যে, তার দাড়িওয়ালা লোক পছন্দ নয়; বরং ঘৃণা লাগে। বাবা-ভাইদের চাপে কিছু বলতে পারে না। আমি এ কথা শুনার পর বলেছি, তার ঈমান আছে কি না সন্দেহ আছে। কারণ একজন ঈমানদার লোক দাড়িকে অপছন্দ করতে পারে না। আমি এ কথা বলার পর থেকে আমার ভয় লাগছে, আমার কথা মিথ্যা হল কি না? আমার কোনো গুনাহ হল কি না? আমি এখন কী করতে পারি?

উত্তর : দাড়ি নবীগণের আদর্শ এবং এটা ইসলাম ও মুসলমানের বিশেষ নিদর্শন। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা মোচকে খাট কর আর দাড়িকে লম্বা কর ও মুশরিকদের বিরোধিতা কর। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৮৯২), অন্য হাদীসে আছে, দশটি জিনিস ফিতরাত অর্থাৎ মানবস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, তার মধ্যে একটি হল মোচকে খাটো করা আর দাড়ি (কমপক্ষে একমুষ্টি পরিমাণ) লম্বা করা।

দাড়ি রাখার ব্যাপারে আরো অনেক হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। দাড়ির কারণে যদি কেউ কোনো মুসলমানকে অপছন্দ করে এবং ঘৃণা করে তাহলে অপছন্দকারী ও ঘৃণাকারীর ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার এই কাজ কুফুরী কাজ হবে।

প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার ঐ আত্মীয়ার ব্যাপারে আপনার উক্ত মন্তব্য সঠিক হয়েছে। আপনি যে কথা বলেছেন তার কারণে আপনার কোনো গুনাহ হবে না।

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৮৯২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৮৩, ফাতাওয়া বাইয়িনাত ১/৩৯৩)

ইবাদাত

ফরিদুজ্জামান
সাভার, ঢাকা

৫৭ প্রশ্ন : মুক্তাদীর যদি কোনো ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে তার করণীয় কি?

উত্তর : জামাআতের সাথে নামায পড়ার ক্ষেত্রে ইমামের ইক্তিদায় থাকাকালে মুক্তাদীর যদি কোনো ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে তার কোনো করণীয় নেই এবং তার উপর সিজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৮২, আলবাহরুর রায়েক ২/১৭৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৩৭৫)

হাসান ইমাম
আলআমীন রোড, কাঠাল বাগান, ঢাকা

৫৮ প্রশ্ন : যদি ইমাম সাহেব প্রতিদিন ফজরের পরে ইজতিমায়ীভাবে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করেন তাহলে এমন ইমামের পিছনে ইক্তিদা করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রতিদিন ইজতিমায়ীভাবে ফজরের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়া এমন কোনো অন্যায় নয় যার কারণে কারো পিছনে ইক্তিদা করা নাজায়েয বা মাকরূহ হবে।

উল্লেখ্য, নামাযের পরে হাদীসে যেসব আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে তা একাকী করার আমল। এসব আমল ইজতিমায়ীভাবে করা উচিত নয়। তবে মুসল্লীদেরকে শিখানোর জন্য কিছুদিন ইজতিমায়ীভাবে করা যেতে পারে। যখন তাদের শেখা হয়ে যাবে তখন ইজতিমায়ীভাবে আমল করা বন্ধ করে দিবে।

قال فى البحر: إمام يعتاد في كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة وشهد الله ونحوه جهرا لا بأس به والافضل الاخفاء.

(মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০১৮৪, আলবাহরুর রায়েক ৪/৪০৯, রদ্দুল মুহতার ২৭/৯৬ শামেলা সংস্করণ, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩১৭)

আবূ আব্দুল্লাহ
আলআমীন রোড, কাঠাল বাগান, ঢাকা

৫৯ প্রশ্ন : একজন মহিলার নাকে ছিদ্র আছে এবং তিনি নাকে অলঙ্কার ব্যবহার করেন। এতে উযূর সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়, যেন ছিদ্রে পানি পৌঁছে। বর্তমানে তিনি নাকের ছিদ্রটি বন্ধ করতে চান। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার করণীয় কি?

উত্তর : নাকে অলঙ্কার ব্যবহার করা পরিহার করার দ্বারা যদি স্বাভাবিকভাবে

ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো ভাল, এছাড়া ছিদ্র বন্ধ করার বিশেষ কোনো পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। এটা সার্জারী ডাক্তারদের বিষয়। এটা নিয়ে তাদের সাথে আলাপ করা যেতে পারে।

তবে উক্ত ছিদ্র বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোসলের সময় তাতে পানি পৌঁছাতে হবে। আর উযূর ক্ষেত্রে ছিদ্রের বহিরাংশে ভালোভাবে পানি পৌঁছাতে হবে। তবে উযূ-গোসল কোনো ক্ষেত্রেই ছিদ্রে পানি পৌঁছানোর জন্য কেনো কাঠি বা এ জাতীয় কোনো জিনিস ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। বরং আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে যতটুকু পৌঁছানো যায় তাই যথেষ্ট।

وسئل نجم الدين النسفي رحمه الله عن امرأة تغتسل من الجنابة هل تتكلف لإيصال الماء إلى ثقب القرط، قال: إن كان القرط فيه وتعلم أنه لا يصل الماء إليه من غير تحريك فلا بد من التحريك كما في الخاتم، وإن لم يكن القرط فيه إن كان لا يصل الماء إليه لا تكلف، وكذلك إن انضم ذلك بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط فيه إلا بتكلف لا تتكلف أيضاً، وإن كان بحيث لو أمرَّت الماء عليه دخله، ولو عدلت لم يدخله أمرت الماء عليه حتى يدخله، ولا تتكلف إدخال شيء فيه سوى الماء من خشب أو نحوه لإيصال الماء إليه.

(সূরা মায়েদা-৬, আল মুহীতুল বুরহানী ১/৮৪, রদ্দুল মুহতার ১/২৭১, আলবাহরুর রায়েক ১/৮৮)

উম্মে সা'দিয়া

নারায়নগঞ্জ

৬০ প্রশ্ন : আমার কোমর ও পায়ে ব্যথা। নামায পড়ার সময় বৈঠক করতে ও স্বাভাবিক নিয়মে রুকু সেজদা করতে কষ্ট হয়। স্বাভাবিক নিয়মে নামায পড়লে কখনো কখনো ব্যথা অনেক বেড়ে যায়। এ কারণে ডাক্তার আমাকে চেয়ারে বসে নামায পড়তে বলেন। আর সম্ভব হলে শুধু ফরয নামায দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে পড়ার জন্য বলেছেন।

এখন আমি শুধু ফরয নামায দাড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে পড়ার চেষ্টা করি। বিতির নামাযসহ অন্যান্য নামাযে কিয়াম ও রুকু দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে আদায় করি এবং সিজদা চেয়ারে বসে ইশারায় আদায় করি। আমার এভাবে নামায পড়া ঠিক আছে কি না? ঠিক না হলে কীভাবে পড়তে হবে?

উত্তর : অসুস্থতার কারণে যে মুসল্লী যথানিয়মে সিজদা করার পরিবর্তে বসে ইশারা করে সিজদা করতে বাধ্য হয়, তার জন্য উত্তম পদ্ধতি হল নামাযের সব রুকনই বসে আদায় করা। দাঁড়ানো তার জন্য আবশ্যক নয়, উত্তমও নয়। এতদসত্ত্বেও যদি সে কিয়ামের সময় দাঁড়ায় এবং যথা নিয়মে রুকু করে আবার চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করে তাতেও তার নামায হয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান-১৯১, আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী ১/২৮৪, সহীহ বুখারী; হা.নং ১১১৭, রদ্দুল মুহতার ২/৬৪৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৬৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৬, আলবাহরুর রায়েক ২/২০৫)

ফারহানা

মুহাম্মদপুর, ঢাকা

৬১ প্রশ্ন : আমার উপরের মাড়ির সামনের একটা দাঁত জন্মগতভাবেই উঠেনি। এখানে আমি একটি আলাদা দাঁত লাগিয়েছি, যা খোলা যায় না। এই দাঁত থাকার কারণে আমার ফরয গোসলে কি কোনো অসুবিধা হবে? এই দাঁতসহ যদি আমি মারা যাই সেক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা আছে?

উত্তর : কৃত্রিম দাঁত যদি খোলা না যায় বা খোলা যদি কঠিন হয়, তাহলে উযূ-গোসলের সময় তা খোলার প্রয়োজন নেই এবং মৃত্যুর পরও খোলা আবশ্যক নয়। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬২, বাদায়েউস সানায়ে ৪/৩১৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩, আলবাহরুর রায়েক ১/৮৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/১৬২)

ফাহিম রহমান

ঢাকা

৬২ প্রশ্ন : ক. সকালে সূরা ইয়াসীন, ইশরাকের নামায, চাশতের নামায, মাগরিবের পর আওয়াবীন নামায, সূরা ওয়াকিয়ার আমল, রাতে সূরা মুলকের আমল এবং প্রতি ফরয নামাযের পরে দুই রাকাআত নফল এগুলো নির্দিষ্ট সময়ে আমল করা ঠিক কি না? এবং এগুলোর দলীল আছে কি না? এসব আমল ছুটে গেলে গুনাহ হবে কি না?

খ. আমি শুনেছি জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে নামায কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। এ কথা সহীহ কি না? বা এর কোনো দলীল আছে কি না?

উত্তর : ক. শরীয়তে নফল ইবাদাতের বিধান রাখা হয়েছে, যা বন্দার উপর আল্লাহর অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, ফলে আমি তাকে ভালোবাসি'। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৫০২)

তাছাড়া সাধারণত আমাদের ফরয ইবাদাতের মধ্যে বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েই থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দয়া ও মেহেরবানী করে নফল ইবাদাতের দ্বারা ফরয ইবাদাতের ক্রটিবিচ্যুতি ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। সুনানে তিরমিযীতে এসেছে, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হবে। যদি ফরয নামাযে কিছু ক্রটি পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, 'দেখ আমার বান্দার আমল নামায় অন্য কোনো নেকী তথা সুন্নাত ও নফল ইবাদাত আছে কি না, যার মাধ্যমে ফরযের ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করা যায়।' ফরয নামায ছাড়া বাকী আমলের হিসাবও অনুরূপ হবে। ফরয রোযার ক্রটি নফল রোযার মাধ্যমে, যাকাতের ক্রটি নফল দানের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৪১৩)

অতএব, আল্লাহর আশেক ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য নফল ইবাদত তথা কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন ইত্যাদি নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়াই কাম্য। তবে এসব আমল কখনো ছুটে গেলে গুনাহ হবে না।

প্রশ্নে উল্লিখিত আমলগুলোর বিশ্লেষণ-

সূরা ইয়াসীন ও সূরা ওয়াকিয়া : এ দু'টি সূরা কুরআনে কারীমের অধিক বরকতপূর্ণ সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে একাধিক সহীহ হাদীস বিদ্যমান। অবশ্য এ সূরাগুলো কখন পড়তে হবে এবং কখন পড়া যাবে না এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। কাজেই সূরাদ্বয়ের ফযীলত অর্জনের জন্য যেকোনো সময়ই তা তিলাওয়াত করা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, *সুনানে দারেমী*র এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পড়বে তার সকল প্রয়োজন পূরা করা হবে। উক্ত কিতাবেরই আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ রাতে মাফ করে দিবেন। (সূনানে দারেমী; হা.নং ৩৪১৭, ৩৪১৮)

আর সূরা ওয়াকিয়া সম্পর্কে আছে, যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করবে সে কখনো দরিদ্রতার সম্মুখীন হবে না। (আততারগীব ওয়াততারহীব; হা.নং ২৪৭৩)

শাস্ত্রীয় বিচারে তিনটি হাদীসের সনদই যঈফ। এতদসত্ত্বেও যেহেতু সমমানের কিংবা এর চেয়ে সবল কোনো হাদীসের সঙ্গে এ হাদীসগুলোর কোনো বৈপরীত্য নেই। তথাপি যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ স্বয়ং কুরআনেই দেয়া হয়েছে। অপর দিকে ফযীলতের ব্যাপারে দুর্বল হাদীসও শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। তাই সকালে সূরা ইয়াসীন এবং মাগরিবের পর সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করতে কোনো সমস্যা নেই। উক্ত সময়ে এই দুই সূরাও যেমনিভাবে পড়া যাবে তেমনিভাবে নিজ ইচ্ছা ও সুবিধামত অন্যান্য সূরাও পড়া যাবে। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াললাইলাহ; হা.নং ৬৮, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৭/৫১৭, সুনানে দারেমী; হা.নং ৩৪১৭, ৩৪১৮, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০১৭৮, আল আজবিবাতুল ফাযিলাহ; পৃষ্ঠা ৪১)

সূরামুলক : রাত্রে সূরা মুলকের আমল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে যা পাঠকারী ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে এমনকি তার সুপারিশ কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তাহল সূরা তাবারাকাল্লাযী। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৮৯৬ হাদীসটি হাসান পার্যায়ের)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে 'তাবারকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর মাধ্যমে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় উক্ত সূরাকে 'সূরায়ে মানেআহ' নাম রেখেছিলাম। (সুনানুল কুবরা নাসাঈ ৯/২৩৬, মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৩৮৩৯)

হযরত জাবের রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ আলিফ লাম মীম সাজদাহ ও তাবারাকাল্লাযী না পড়তেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতেন না। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৩৫৪৫ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ)

ইশরাক যুহা বা চাশত : সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর থেকে ইশরাক ও চাশতের নামাযের সময় শুরু হয় এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের মাকরূহ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত তা বাকি থাকে। তবে এই সময়ের প্রথম অংশে ইশরাক এবং শেষ অংশে চাশতের নামায পড়া উত্তম। এই উভয় নামাযই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আনাস রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে, তারপর দুই রাকাআত নামায পড়বে সে একটি হজ্জ ও উমরার সাওয়াব লাভ করবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৫৮৫ হাদীসটি হাসান)

হযরত আবূ দারদা রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! দিনের শুরু অংশে চার রাকাআত নামায পড়া থেকে বিরত থেকো না; আমি তোমার সারাদিনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবো। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৮৩২৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা.নং ৩৪০৯, ৩৪১০ হাদীসগুলোর সনদ সহীহ)

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, আমার খলীল (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ে নসীহত করেছেন। যেগুলো আমি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো ছাড়তে চাই না। (এক) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা। (দুই) চাশতের নামায পড়া। (তিন) বিতিরের নামায (অন্য হাদীসে তাহাজ্জুদের নামায) পড়ে ঘুমানো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১১৭৮)

হযরত আবূ যর থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে তার শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ার সুস্থতার শুকরিয়া স্বরূপ প্রতিদিন একটি সদকা করা উচিত। সুতরাং একবার সুবহানাল্লাহ বলা একটি সদকা। একবার আলহামদুলিল্লাহ বলা একটি সদকা। একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি সদকা। একবার আল্লাহু আকবার বলা একটি সদকা। সৎকাজে আদেশ করা সদকা। অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা সদকা। আর প্রত্যেক জোড়ার শুকরিয়া একত্রে আদায় করার জন্য চাশতের সময় দুই রাকাআত আদায় করাই যথেষ্ট। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭২০, ৭২২)

হযরত বুরাইদা রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রতিটি মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। সুতরাং তার কর্তব্য হল, প্রতিটি জোড়ার পক্ষ থেকে একটি করে সদকা করা। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই পরিমাণ সদকা করতে কে সক্ষম হবে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদের মধ্যে পতিত থুথুকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া সদকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া সদকা। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে দুই রাকাআত চাশতের নামায তোমার জন্য যথেষ্ট। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৫২৪২ হাদীসটি সহীহ)

মাগরিবের পর আউয়াবীন নামায : মাগরিবের পর আওয়াবীন পড়ার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এই ধারায় সর্বযুগে আল্লাহ প্রেমিক বান্দাগণ এই নামায পড়ে আসছেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, যেসব সাহাবীগণ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল পড়তেন তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন যে, 'তাদের পাজর বিছানা থেকে আলাদা থাকে'। (সূরা সাজদা-১৬, যাদুল মাসীর ১৬/২৩৯, তাফসীরে তবারী ২১/১১৬)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল মারওয়াযী (মৃত ২৯৪হি.) *কিয়ামুললাইল* গ্রন্থে অনেক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তারা এ সময় নফল নামায পড়তেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, আউয়াবীনের নামাযের ক্ষেত্রে ছয়, চার, বিশ রাকাআত ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনো হাদীসই যয়ীফ বা মাজহুল বর্ণনাকারী থেকে মুক্ত নয়। তা সত্ত্বেও এর আমল রয়েছে। কারণ ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার সুযোগ রয়েছে। অপর দিকে হযরত ইরাকী রহ. এই বিষয়ে অনেক সাহাবা ও তাবেঈদের নাম উল্লেখ করেছেন যারা এই নামায পড়তেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, সালমান ফারসী, ইবনে উমর রাযি. প্রমুখ সাহাবীগণ। তাবেয়ীদের মধ্যে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, সাঈদ ইবনে জুবায়েরসহ আরো অনেকে, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মধ্যে থেকে ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ.

এই নামায পড়তেন। এ সকল আকাবির এই আমল করেছেন। এই উম্মতের শুরু লগ্নের এবং পরের নেককার লোকদের এর উপর আমল করা এই হাদীসগুলো অর্থগতভাবে সহীহ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যদিও এসব হাদীস সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল। (মা'আরিফুস সুনান ৪/১১৮)

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দুই রাকাআত : ফরয নামাযের পর দুই রাকাআত পড়ার প্রমাণ রয়েছে। তবে অন্য এক হাদীসে ফজর ও আসরের পর সুন্নাত ও নফল পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের পর দুই রাকাআত, মাগরিব ও ইশার পর দুই রাকাআত পড়তেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১১৬৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৮৮২, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১১৩২)

হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতিদিন বারো রাকাআত নফল নামায পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭২৮)

অন্য হাদীসে আছে, ফরযের পর দুই রাকাআত পড়া তিনশত উকিয়া (তিন হাজার তোলা রূপা) গনীমতের মাল পাওয়ার চেয়েও উত্তম। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৭৭৮ হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল তবে আমলযোগ্য)

প্রশ্নে উল্লেখিত আমলগুলো যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত করতেন তাহলে এগুলো উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যা উম্মতের জন্য কষ্টকর হত। এজন্য তিনি এই আমলগুলো নিয়মিত করেননি। তবে উম্মতকে এগুলো করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর আসর ও ফজর ব্যতীত বাকি তিন ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর দুই রাকাআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই পড়তেন, এজন্য ঐ নামাযগুলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হয়েছে। ফরযের পরের দুই রাকাআত কখনো কোনো কারণবশত ছুটে গেলে গুনাহ হবে না। তবে ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস হয়ে গেলে গুনাহ হবে। আর বাকি আমলগুলো না করলে কোনো গুনাহ হবে না। তবে অনেক সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। (রদ্দুল মুহতার ১/১০৪, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যা ৪/১২৭)

খ. পুরুষদের জন্য জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং এর অনেক ফযীলাতও আছে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে ফরয নামায আদায়ের জন্য রওনা হয়, অতঃপর জামাআতের সাথে ফরয নামায আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৪৬) আরেক হাদীসে এসেছে, জামাআতের সাথে নামায আদায়কারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৫১১২ সাদীসটি হাসান)

অপরদিকে জামাআত ত্যাগকারীর ব্যাপারে অনেক ধমক এসেছে। এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআত ত্যাগকারীদের ঘরসমূহে মহিলা ও শিশু না থাকলে সেগুলো আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮৭৮২)

মোটকথা ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব এবং অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ। কাজেই তা জামাআতের সাথে আদায় করলে কবুল হওয়ার আশা বেশি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। (সূরা বাকারা-৪৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২০২, রদ্দুল মুহতার ২/২৮৭)

আতীকুল ইসলাম
ঈশ্বরদী, পাবনা।

৬৩ প্রশ্ন : বেশির ভাগ আন্তঃনগর ট্রেনে নামাযের কক্ষ রয়েছে। তবে ট্রেন চলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া কঠিন হয়। কারণ ঝাঁকুনির দরুন পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় বা পড়েও যায়। আবার নামায অবস্থায় ট্রেন দিক পরিবর্তন করলে কেবলা ঠিক রাখা মুশকিল হয়। এমতাবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করব?

উত্তর : ট্রেন চলা অবস্থায় নামাযের কক্ষে দাঁড়িয়ে এবং কেবলার দিকে ফিরেই নামায আদায় করবে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি এমন দুর্বল হয় যে, দাঁড়ালে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাবোধ করে তাহলে সে বসে নামায আদায় করবে। আর যদি নামাযের মধ্যে ট্রেন কেবলার দিক থেকে ঘুরে যায় এবং সে ঘোরার অবস্থা জানতে পারে তাহলে সেও সাথে সাথে কেবলার দিকে ঘুরে যাবে। আর যদি সে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি নামাযের পরে জানতে পারে তাহলে আর উক্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪৪, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৬০৮, ৬২৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৮৭)

বিবাহ-তালাক

রুহুল আমীন
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

৬৪ প্রশ্ন : যদি কেউ বিয়ের পূর্বে বলে যে, 'আমি যাকে বিয়ে করবো সেই তালাক' তাহলে সে যাকেই বিয়ে করবে সেই তালাক হয়ে যাবে? যদি এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে এই লোকের বিয়ে করার উপায় কি?

উত্তর : বিবাহ একটি ইবাদত এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এতে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু কল্যাণ নিহিত আছে। এর মাধ্যমে নর-নারী বিভিন্ন ধরণের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে এবং নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। তাছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অতএব কারো এ কথা বলা যে, 'আমি যাকে বিয়ে করবো সেই তালাক' একেবারেই অন্যায় ও অনুচিত। হাসি-তামাশা বা ইচ্ছা করে এ ধরনের কথা বলে বিবাহ থেকে বিরত থাকা খুবই গর্হিত কাজ হবে।

যাই হোক 'আমি যাকে বিবাহ করবো সেই তালাক' এ ধরণের কথা বলার কারণে সে যাকেই বিয়ে করবে বিয়ের সাথে সাথে তার উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। যারা এ ধরনের কথা বলে ফেলে তাদের জন্য ফুকাহায়ে কেরাম দু'টি উপায় বের করেছেন।

এক. উক্ত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের কেউ তার অনুমতি ব্যতীত নিজের পক্ষ থেকে তাকে বিয়ে করিয়ে দিবে আর সে মৌখিকভাবে সম্মতি না দিয়ে কাজের মাধ্যমে সম্মতি দিবে। যেমন বিবির মহর আদায় করে দিবে, তার প্রয়োজনীয় সামানপত্র কিনে দিবে।

দুই. প্রথম বিবাহের কারণে যার উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে তাকে বিবাহের যাবতীয় শর্তসহ দ্বিতীয় বার বিবাহ করে নিলেও চলবে। বিবাহ

দোহরানোর পরে এই স্ত্রীর উপর উক্ত কথার কারণে নতুন কোনো তালাক পতিত হবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪১৯, আল ফিকহুল ইসলামী ৯/৬৮৯৩, রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫২, আলবাহরুর রায়েক ৪/২৭)

মাহমূদ

সাতক্ষীরা

৬৫ প্রশ্ন : জিহাদ না করা বা জিহাদকে এড়িয়ে চলা বা জিহাদের আয়াত, হাদীস ও ফযীলতসমূহ দ্বারা অন্য কোনো ইবাদতকে সাব্যস্ত করা কেমন?

উত্তর : সশস্ত্র জিহাদ একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এর জন্য কিছু আবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে। সে শর্তের অবর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ করা মুসলমানদের নিজেদের ক্ষতির কারণ হয়। সেক্ষেত্রে তা থেকে এড়িয়ে চলা বা তাতে অংশ গ্রহণ না করাই শরীয়তের বিধান। হ্যাঁ, শর্তসাপেক্ষে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পর কোনো আকেল বালেগ স্বাধীন মুসলমান পুরুষের জন্য জিহাদ না করা বা জিহাদকে এড়িয়ে চলার কোনো সুযোগ নেই।

আর জিহাদ ব্যাপক অর্থবহ একটি শব্দ। আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ করা যদিও জিহাদ শব্দের চূড়ান্ত রূপ, কিন্তু আল্লাহর দীন যিন্দা করার জন্য যত লাইনে দীনের মেহনত হচ্ছে প্রত্যেকটাই কুরআন-হাদীসের ভাষ্যমতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে জিহাদের আয়াত হাদীস ও ফযীলতের মাধ্যমে অন্য দীনী মেহনত প্রমাণিত করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কিতালের আয়াত-হাদীস ও ফযীলত দ্বারা অন্য কেনো দ্বীনী মেহনত সাব্যস্ত করা যাবে না। তাহলে সেটা তাহরীফ ফিদ্দীন এর আওতায় পড়ে যাবে। (সূরা বাকারা-১৯০, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৪৯৬, ২/৪০৮, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৫০৪, আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ ১/৯৫, আলবাহরুর রায়েক ৫/১১৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/২৭)

মুআমালাত

আযরা ইসলাম

কাপাসিয়া, গাজিপুর

৬৬ প্রশ্ন : আমার স্বামীর মোবাইল এবং তার বিল তার অফিস থেকে দেয়া হয়। বিল দেয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। মাস শেষে বিল যত টাকা হয় তত টাকাই দেয়া হয়। স্বামী বাসায় থাকাকালে আমি তার মোবাইল দিয়ে আমার আত্মীয়-স্বজনের বাসায় ফোন করি। এটা কি শরীয়তসম্মত হয়?

উত্তর : অফিস থেকে আপনার স্বামীকে যে মোবাইল ফোনটি দেয়া হয়েছে, যার বিল অফিস বহন করে থাকে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল, যদি মোবাইল সেট ও বিল শুধু অফিসিয়াল কাজের জন্য দিয়ে থাকে তাহলে আপনার স্বামী ও আপনি বা অন্য কেউ নিজ প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা আমানতের খেয়ানত হবে। বিধায় তা নাজায়েয ও হারাম হবে।

আর যদি অফিস কর্তৃপক্ষ মোবাইলটি আপনার স্বামীর ব্যক্তিগত ও অফিসিয়াল উভয় কাজের জন্য দিয়ে থাকে এবং আপনাদের নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারের বিষয়টা অফিস কর্তৃপক্ষ জানার পরও কোনো আপত্তি না করে তাহলে উক্ত মোবাইল দিয়ে আপনার ফোন করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য উত্তম হল, বিয়ষটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করে নেয়া। (সূরা আনফাল ২৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৩, আল মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ৬/২৩৭)

আকরাম হুসাইন

মোমেনশাহী

৬৭ প্রশ্ন : জনৈক আলেম দীর্ঘ বাইশ বছর যাবত দীনী খেদমত করছেন। খেদমত থেকে যে হাদিয়া পান তা থেকে অল্প অল্প বাঁচিয়ে গত বছর হজ্জ করতে যান। যে প্রতিষ্ঠানে থাকাবস্থায় তিনি হজ্জ করতে যান সেখানে তিনি আট বছর ধরে খিদমত করছেন। হজ্জের সফরটি ছিল ৪৮ দিনের। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের থেকে ছুটি বা অনুমতি নিয়েই তিনি হজ্জে গিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাকে শুধু আঠারো দিনের বেতন দিয়েছে বাকী ৩০ দিনের বেতন দেয়নি। অথচ তিনি দীর্ঘ আট বছরের মধ্যে কোনো ছুটি কাটাননি। আর কর্তৃপক্ষ তাকে বাকী ৩০ দিনের বেতন না দেয়ার ক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছার উপর আমল করেছে। কারণ উক্ত মাদরাসা এ ব্যাপারে লিখিত, মৌখিক বা কর্মগত কোনো নিয়ম নেই।

ইতিপূর্বেও কর্তৃপক্ষ নিজেরা তাশকীল করে দুইজন উস্তাদকে চিল্লায় পাঠানো সত্ত্বেও তাদেরকে মাত্র দশ দিনের বেতন দিয়েছে বাকি ত্রিশ দিনের বেতন দেয়নি। উল্লেখ্য, উক্ত আলেম যদিও ফরয হজ্জ করেছেন কিন্তু তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল না।

এখন জানার বিষয় হল-

ক. উক্ত হজ্জকারী শিক্ষককে ত্রিশ দিনের বেতন না দেয়াটা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না?

খ. তার জন্য উক্ত বেতন দাবি করা বৈধ কি না?

গ. হজ্জ ফরয ও নফল হওয়ার সাথে বেতনের কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

উত্তর : ক. উক্ত আলেম যে মাদরাসায় খেদমত করছেন সেখানে দীর্ঘ ছুটির বেতন না দেয়ার লিখিত বা মৌখিক সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকলেও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যেহেতু দু'জনকে চিল্লার ছুটিতে একমাস করে বিনা বেতনে ছুটি প্রদান করেছে। তাই কর্তৃপক্ষের এই আমল দ্বারা দীর্ঘ ছুটির বেতন না দেয়ার নিয়মই প্রমাণিত হয়। সুতরাং মৌখিক ছুটি নেয়া সত্ত্বেও উক্ত আলেমকে এক মাসের বেতন না দেয়া শরীয়তসম্মত হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাদরাসা কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ ছুটির বেতনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত এবং এ নিয়ম সকল শিক্ষককে জানিয়ে দেয়া ও সকলের জেনে নেয়া উচিত। যাতে করে সে নিয়ম অনুযায়ী আমল করা যায় এবং সেটা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়।

খ. উক্ত আলেমের জন্য বাকি এক মাসের বেতন দাবি করা বৈধ হবে না।

গ. হজ্জ ফরয বা নফল হওয়ার সাথে বেতনের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ফরয হজ্জের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিশেষ ছাড় দেয়া উচিত। (রদ্দুল মুহতার ৪/৪১৮-১৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/৯৭, ১৯২)

আরমান

ধুপখোলা রোড, ঢাকা।

৬৮ প্রশ্ন : বিত্তবান ব্যক্তিরা নিজেদের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখে, যেন বড়ো হয়ে ঐ টাকা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। প্রশ্ন হলো, জমাকৃত টাকা যদি নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে তাদের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে কি না? আর ওয়াজিব হলে কার সম্পদ থেকে আদায় করবে? পিতা নিজের সম্পদ থেকে আদায় করবে না বাচ্চার সম্পদ থেকে?

উত্তর : ছেলে-মেয়েদের নামে খোলা একাউন্টে জমাকৃত টাকার মালিক তারা

নিজেরাই। অতএব ঐ টাকা নিসাব পরিমাণ হলে তাদের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। তবে তারা নাবালেগ হলে তাদের সম্পদ থেকে পিতার উপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। পিতা যদি আদায় না করে তাহলে তাদেরকে বালেগ হওয়ার পরে আদায় করতে হবে। (আদদুররুল মুখতার ৩/৩১২, আলবাহরুর রায়েক ২/৪৩৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯২, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৭৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৪১)

ওয়াকফ

জনাব সেলিম মাহমুদ

তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

৬৯ প্রশ্ন : মুহাম্মদপুর তাজমহল রোডে অবস্থিত বাইতুল ফেরদাউস জামে মসজিদে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ হতে নামায আদায় করা হচ্ছে। মূলত এটা ছিল সরকারী খাস জমি। পরবর্তীতে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ ও মসজিদ উন্নয়নের স্বার্থে মার্কেট করার জন্য ঐ জমিটির সরকারী রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হয়। তারপর জমিটির দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে মসজিদ এবং উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে মার্কেট চালু করা হয়। কিন্তু বর্তমানে মসজিদে মুসল্লী সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এখন আমাদের জানার বিষয় হল, বর্তমান মসজিদ ও মার্কেট উভয়টি ভেঙ্গে এর বেইজমেন্ট ফ্লোরে মার্কেট নির্মাণ করে তার উপর তলা হতে মসজিদ করা জায়েয হবে কি না? রেফারেন্সসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : সরকারী খাস জমিনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়া হলে সেটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ মসজিদ হয়ে যায়। যা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসাবে বহাল থাকবে। তার উপ-নিচ কোনো অংশ মসজিদ থেকে বাদ দিয়ে দেয়া বা অন্য কোনো কাজে লাগানো বা বিক্রি করা বা ভাড়া দেয়া মসজিদের বেহুরমতি-অবমাননা এবং নাজায়েয কাজ। কাজেই পুনঃনির্মাণের সময়ও বর্তমানে মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত অংশ মসজিদ হিসেবেই বহাল রাখতে হবে।

সেখানে মার্কেট বানানো বা মসজিদ উন্নয়নের জন্য অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। সুতরাং যতটুকু স্থান এতদিন মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল পুনঃনির্মাণের পরও ততটুকু স্থান তার উপর-নিচসহ মসজিদ হিসেবেই ব্যবহার করতে হবে। আর যতটুকু স্থান মার্কেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে তাতে মসজিদ উন্নয়নের জন্য মার্কেটসহ অন্য যেকোনো বৈধ কিছু করা যাবে। এতে শরীয়ত মতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

(সূরা জিন-১৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৫৪৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৭১, মাজমাউল আনহুর ফি শরহি মুলতাকাল আবহুর ২/৫৯৩, ই'লাউস সুনান ১৩/২০০, ইমদাদুল আহকাম ৩/২৬৯)

জাহিদুল ইসলাম

কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

৭০ প্রশ্ন : মসজিদের মাইক দ্বারা হারানো বিজ্ঞপ্তি বা শোক সংবাদ অথবা অন্য কোনো ঘোষণা দেয়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত মাইক দ্বারা দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে তথা হারানো বিজ্ঞপ্তি, শোক সংবাদ বা অন্য কোনো ধরনের ঘোষণা দেয়া জায়েয নেই। তবে যদি দাতা ওয়াকফ করার সময় মসজিদের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য বৈধ কাজেরও অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে এ সকল ক্ষেত্রেও উক্ত মাইক ব্যবহার করা জায়েয হবে। (আদদুররুল মুখতার ৬/৬৪৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪৬৩, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ২/১১৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/৩৯৯)

বিবিধ

ইকবাল মাহমূদ

নেত্রকোনা

৭১ প্রশ্ন : আরবী ও বাংলা ভাষার মান ও মর্যাদা কি এক? আরবী লিখিত কাগজসহ যেকোনো ভাষায় লিখিত কাগজ পদদলিত করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : আরবী বাংলাসহ অন্য সকল ভাষা আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি হিসাবে প্রত্যেক ভাষাই সমান; এক ভাষার উপর অন্য ভাষার মর্যাদা নেই। তবে আল্লাহ তা'আলার কালাম 'আল কুরআন' যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবীভাষী ছিলেন এবং হাদীসও আরবী ভাষায় সংরক্ষিত হয়েছে তাই অন্য সব ভাষার উপর আরবী ভাষার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যেহেতু ইসলামের ভিত্তিমূল অর্থাৎ কুরআন-হাদীস আরবী ভাষায়, তাই মুসলিম উম্মাহর কাছে আরবী ভাষা যেকোনো ভাষার তুলনায় বেশি মর্যাদাশীল।

কাগজ ইলম অর্জনের মাধ্যম। কাগজ মাত্রই তার যথাযথ সম্মান করা উচিত এবং পদদলিত করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। চাই তার উপর আরবী, বাংলা বা অন্য কোনো ভাষা লিখিত থাকুক না কেন। কাগজ চলাচলের স্থানে পতিত দেখলে উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিবে।

বি.দ্র. আরবী ভাষার ফযীলত সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আমাদের জানামতে সেসব হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। (সূরা ইউসুফ ২, রদ্দুল মুহতার ৬/৪১৯, ১/৩৪১, তাযকিরাতুস সামে' ওয়ালমুতাকাল্লিম; পৃষ্ঠা ১৫৯)

আব্দুল্লাহ আব্বাস

কেশবপুর, খুলনা

৭২ প্রশ্ন : সিগারেট খাওয়া এবং জর্দাসহ পান খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : সিগারেট খাওয়া অর্থাৎ ধুমপান করা সাধারণ অবস্থায় মাকরূহে তানযীহী। আর তা অন্যের কষ্টের কারণ হলে মাকরূহে তাহরীমী।

জর্দায় গন্ধ ও ক্ষতির পরিমাণ সিগারেটের তুলনায় কম। তাই জর্দাসহ পান খাওয়া জায়েয আছে। তবে জর্দা যদি এত অধিক পরিমাণে খায় যা শারীরে ক্ষতির আশংকা তৈরি করে কিংবা দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে অন্যের কষ্টের কারণ হয় তাহলে মাকরূহ হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৪৭৪, রদ্দুল মুহতার ১০/৪৩, মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১০/১০৭, নফউল মুফতী ওয়াস্সায়েল ৪/১৪৭)

হুমায়রা

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৭৩ প্রশ্ন : মাহরামের সাথে পর্দা রক্ষা করে মেয়েদের জন্য মটর সাইকেলের পিছনে চড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মেয়েদের জন্য পর্দা রক্ষা করে স্বামী কিংবা মাহরামের সাথে মটর সাইকেলের পিছনে বসা জায়েয আছে। তবে পুরুষদের মত দু'পাশে পা ছড়িয়ে বসবে না। কারণ দু'পাশে পা ছড়িয়ে

বসলে পরিপূর্ণভাবে পর্দা রক্ষা হয় না। (সূরা আহযাব-৫৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৫০৩, তাফসীরে তবারী ২২/৫৫, বাদায়িউস সানায়ে ৪/২৯২)

নাজমুল হাসান
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

৭৪ প্রশ্ন : ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে আমাদের দেশীয় ও আরব উলামাদের অভিমত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে ভারত উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের মতামত হুবহু তাই যা দারুল উলূম দেওবন্দের এ সংক্রান্ত ফাতওয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়ার সারাংশ অনুবাদ করে দেয়া হল।

ডা. জাকির নায়েক অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে দূরে সরে গেছেন। কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের মত করে ব্যাখা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যা করে বসেছেন। তিনি উলূমে শরইয়্যাহ ও মাকাসেদে শরইয়্যাহ এর ব্যাপারে কোনো বিজ্ঞ আলেমের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক পাণ্ডিত্ব অর্জন করা ব্যতীতই মুজতাহিদ সুলভ ব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছেন। ইজতিহাদী মাসাইলের ক্ষেত্রে তিনি কোনো ইমামের তাকলীদ করেন না। বরং মুজতাহিদ ইমামগণের ত্রুটি বের করার পিছনে পড়েছেন। এজন্য ডা. সাহেবের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই তার প্রোগ্রাম দেখা, বয়ান শুনা এবং তাহকীক করা ব্যতীত তার কথা অনুযায়ী আমল করা দীন-ঈমানের জন্য মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ কাজ। আর তাহকীক করা সকলের সাধ্যে নয়। এজন্য সাধারণ মুসলমানদের উচিত তার প্রোগ্রাম থেকে দূরে থাকা।

প্রত্যেক মুসলমানের সর্বদা এ কথা মনে রাখা জরুরী যে, দীন খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। মানুষ দীনের কথা শোনে এবং তার উপর আমল করে পরকালে নাজাত পাওয়ার জন্য। এর মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করে উত্তর দেয়া এবং অধিক সূত্র বর্ণনা করা, প্রকাশ্যভাবে অনেককে সেটা গ্রহণ করতে দেখে তাহকীক ব্যতীত যে কারো কথার উপর আমল করা কখনোই উচিত হবে না। কারো কথা মানতে চাইলে তার সম্পর্কে এসব বিষয় খেয়াল রাখা উচিত যে, তার দীনী ইলমের গভীরতা কোন পর্যায়ের, সে কার কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছে এবং কোন পরিবেশে বড় হয়েছে, তার বেশভুষা, চলনবলন উলামায়ে কেরাম ও নেককার পরহেযগারদের মত কি না? নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম তাকে হক্কানী আলেম মনে করেন কি না? এমনিভাবে যারা তার সাহচর্যে থাকেন এবং মান্য করেন দীনের ব্যাপারে তারা কতটুকু আন্তরিক। প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. বলেন, তোমরা দীনের ইলম কার থেকে শিক্ষা লাভ করছ সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (সহীহ মুসলিম; ১/১৪ হা.নং)

উল্লেখ্য, আরব আলেমগণের মধ্য থেকে যারা ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হয়েছেন, তারা তার ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দ ও উপমহাদেশের অন্যান্য আলেমদের মতের অনুরূপ মতই পোষণ করেন। আর আরবের কিছু আলেম আছেন যারা পিস টিভি দেখে দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন যেমনিভাবে ইতিপূর্বে মরহুম মওদূদীর বিভিন্ন লেখার আরবী অনুবাদ দেখে আরবের কিছু আলেম বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাকে তারা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দাঈ ও আলেম মনে করতেন। অথচ উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম জানেন যে, মওদূদী কেমন আলেম ছিলেন আর কিসের দাঈ ছিলেন। (চান্দ আহাম আসরী মাসায়েল; পৃষ্ঠা ৯৩-১১২)

আবুল ফযল
কমলাপুর, ঢাকা।

৭৫ প্রশ্ন : ইসলামে দত্তক নেয়ার বিধান কি?

উত্তর : ইসলামে দত্তক নেয়া সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। এর দ্বারা দত্তক গ্রহণকারী দত্তক নেয়া শিশুর পিতা-মাতা হিসেবে গণ্য হবে না এবং ঐ শিশু তাদের ওয়ারিস হবে না। তবে কোনো ব্যক্তি যদি এতিম-অসহায় বা নিঃস্ব শিশুদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাহলে এটা অনেক বড়ো সওয়াবের কাজ হবে। (সূরা আহযাব-৫, ৬, সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৭৮২, ৬০০৫, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১০/১২১, আলহালাল ওয়াল হারাম; পৃষ্ঠা ১৯৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৫৩৬)

সুলতানা পারভীন
বাড্ডা, ঢাকা।

৭৬ প্রশ্ন : শিশুদেরকে কত বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো যাবে, এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত কোনটি? দুধ পান করার বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি কোনো শিশু দুধ পান করে কিংবা কোনো মা পান করায় তবে কাজটি কি হারাম হবে?

উত্তর : শিশুদেরকে সর্বোচ্চ দু'বছর দুধ পান করাতে পারবে। এটিই গ্রহণযোগ্য মত। আর দুধ পান করার বয়স অতিক্রম করার পর দুধ পান করানো জায়েয নেই। (সূরা বাকারা-২৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৪২, ফাতাওয়া খানিয়া ১/৪১৮, ফাতহুল কাদীর ৩/৪২৫, আদদুররুল মুখতার ৩/২১০, ফাতওয়া রহীমিয়া ৮/২৪৯)

ইবরাহীম
চান্দিনা, কুমিল্লা।

৭৭ প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যে খানার আয়োজন করা হয় তাতে শরীক হওয়ার বিধান কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির বাড়িতে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে কুলখানি কিংবা কুরআনখানির মাধ্যমে যে খানাপিনার আয়োজন করা হয় তাতে অংশগ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমী ও বিদ'আত। তবে যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট না করে ঈসালে সওয়াবের (মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব পৌঁছানো) উদ্দেশে শুধু সমাজের অনাথ-অভাবী লোকদের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয় এবং তাতে অংশগ্রহণকারীগণ সদকা গ্রহণের উপযুক্ত হয় ও দাওয়াতপ্রাপ্ত হয়, তবে তাদের জন্য এতে অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে। এর জন্য শর্ত হলো, তাতে আত্মপ্রদর্শন, নাবালেগ শিশুর সম্পদ ব্যবহার এবং অনুমতি ব্যতীত অন্যান্য ওয়ারিশদের সম্পদ ব্যবহার প্রভৃতি শরীয়ত গর্হিত বিষয়গুলোর উপস্থিতি না থাকতে হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৭৫৪, ৪০৩১, মুসনাদে আহমদ (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ১১/৫০৫, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪৮, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৪/৮১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/৩৩৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২৬১)

মাতৃজাতির পোশাক ও পর্দা

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রথম প্রয়োজন খাদ্যের। এরপরই সর্বাধিক গুরুত্ব পোশাকের, যা দ্বারা মানুষ লজ্জাস্থান ঢাকে, শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে বাঁচে, সৌন্দর্যের স্বভাবজাত চাহিদা পূরণ করে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا...

অর্থ : হে আদমের সন্তান-সন্ততি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দোষনীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও উপকরণ। (সূরা আ'রাফ-২৬)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ.

অর্থ : ... এবং তোমাদের জন্য এমন পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন বস্ত্র যা তোমাদেরকে যুদ্ধের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (সূরা নাহল-৮১)

ইসলাম যেহেতু একটি পরিপূর্ণ ধর্ম, তাই জীবনের ছোট-বড়, গৌণ-মুখ্য সব বিষয়েই এর দিকনির্দেশনা রয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারটিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মানুষের কল্যাণেই ইসলাম এ বিষয়ে কতক মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেগুলোর অনুসরণ মুমিন নারী-পুরুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয়; এর ব্যতিক্রম করা বৈধ নয়।

পাশ্চাত্য-কৃষ্টি-কালচার দ্বারা প্রভাবিত এক শ্রেণীর লোকের ধারণা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা একান্তই মানুষের স্বভাবগত বিষয়। মানুষ যুগচাহিদা ও নিজ অভিরুচি অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা-ই গ্রহণ করতে পারে; এ সবের সঙ্গে বৈধ-অবৈধের কোন সম্পর্ক নেই।

তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও অজ্ঞতাপ্রসূত। লেবাস-পোশাকের প্রকৃত রহস্য কী, মানুষের জীবনে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কতটুকু এসব বিষয়ে অবগতি না থাকা এবং চিন্তা-ভাবনা না করাই এ ভুল ধারণার মূল কারণ। বাস্তবতা হচ্ছে, পোশাক যদিও বাহ্যিক বিষয় এবং শরীরের বাইরের সাথেই এর সম্পর্ক, কিন্তু তা ব্যবহারকারীর মন-মননে ও স্বভাব-চরিত্রে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। কোন পোশাক মানব মনে অহংকার-অহমিকার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, কোন পোশাক অন্তরে বিনয়-নম্রতার বীজ বপন করে, আবার কোন পোশাক উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরাধের পথ অবারিত করে।

সুতরাং যিনি মনে করেন, লেবাস-পোশাক কেবলই বাহ্যিক বিষয়; মানব মন ও তার আচার-ব্যবহারের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, তিনি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ।

সঙ্গত কারণেই ইসলাম পোশাকের ব্যাপারটি পূর্ণরূপে মানুষের এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়নি যে, যার যা ইচ্ছা তাই পরবে, যেমন খুশি তেমন সাজবে– এমন অবাধ স্বাধীনতা দুনিয়ার জীবনে ঈমানদারকে দেয়া হয়নি। হ্যাঁ, ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম, জীবনের সব ক্ষেত্রেই তা এমন বিধান আরোপ করেছে, যা মানব-স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল এবং মানুষের স্বাভাবিক রুচি-প্রকৃতির পূর্ণ সমর্থক। কিন্তু রুচিই যদি বিকৃত হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।

মানুষ যেহেতু স্বভাবগত কারণেই খাদ্য-বস্ত্রসহ সব বিষয়ে বৈচিত্র্য পছন্দ করে; কোন এক প্রকারে তুষ্ট হয় না এবং তুষ্ট থাকতেও পারে না, এ কারণে ইসলাম কোন এক প্রকারের পোশাককে ঈমানদারদের জন্য আবশ্যিক করে দেয়নি, কোন নির্দিষ্ট পোশাককে মুসলমানের ইউনিফর্ম ঘোষণা করেনি।

তবে এ বিষয়ে ইসলাম কতক মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এগুলো অনুসরণের পর মুমিন নারী-পুরুষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তারা নিজেদের রুচি ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী যা খুশি পরতে পারবে।

ইসলামে পোশাক-পরিচ্ছদের মৌলিক নীতিমালা

১. পোশাক অবশ্যই সতর ঢাকার উপযোগী হতে হবে : সতর ঢাকা ফরয। ইসলামের বিধানে পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীর সতর তিনটি অঙ্গ ব্যতীত পুরো দেহ। অঙ্গ তিনটি হচ্ছে- মুখমণ্ডল, কব্জি পর্যন্ত হাত এবং টাখনু পর্যন্ত পা।

পোশাক পরিধানের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে সতর ঢাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا...

অর্থ : হে আদমের সন্তান-সন্ততি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দোষনীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও উপকরণ।

এই আয়াত দ্বারা নারী ও পুরুষের সতর ঢাকা ফরয প্রমাণিত হয়। আর সতরের সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে হাদীস দ্বারা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن الفخذ عورة.

অর্থ : উরু সতরের অংশ। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৭৯৮)

ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة.

অর্থ : হাঁটুর উপরে ও নাভীর নীচে যা আছে তা সতর। (সুনানে দারাকুতনী; হা.নং ৮৯০)

إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها الى المفصل.

অর্থ : যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয় তখন তার মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্ট হওয়া বৈধ নয়। (মারাসিলে আবি দাউদ; হা.নং ৪৩৭)

সুতরাং যে পোশাক দ্বারা সতর ঢাকার ফরযটুকু পূর্ণরূপে আদায় হয় না, এমন পোশাক পরিধান করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

২. পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে, আঁটসাঁট ও পাতলা হতে পারবে না : পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে; এমন আঁটসাঁট ও পাতলা হতে পারবে না যা শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে এবং বিভিন্ন অঙ্গের আকৃতি ফুটে ওঠে। পোশাক পরিধানের পরেও চামড়ার রং বা দেহের মূল আকৃতি প্রকাশিত হলে তাকে পোশাক বলা যায় না; বরং তা সুস্পষ্ট নগ্নতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.

অর্থ : দুনিয়ার অনেক বস্ত্রধারিনী আখেরাতে বিবস্ত্র (বলে বিবেচিত) হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১১৫)

তিনি আরো বলেছেন,

سيكون في آخر أمتي رجال.... نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات.

অর্থ : আমার উম্মতের শেষ দিকে এমন কিছু পুরুষ থাকবে.... যাদের নারীরা হবে বস্ত্রধারিনী বিবস্ত্রা, তাদের মাথার উপর উটের কুঁজ বা ঝুটির মত থাকবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দিবে, কারণ তারা অভিশপ্ত। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৭০৮৩)

তিনি আরো বলেন,

صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سباط كاذناب البقر يضربون بها الناس ...

অর্থ : দু' শ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি দেখিনি (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে এদের দেখা যাবে)। এক শ্রেণীর ঐ সকল পুরুষ যারা সমাজে দাপট দেখিয়ে চলে, তাদের হতে থাকে বাকানো লাঠি বা আঘাত করার মত হাতিয়ার যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে মারধর করে বা কষ্ট দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোযখবাসী ঐ সকল নারী যারা পোশাক পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ থাকবে, নিজেরা অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং অন্যদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে। তাদের মাথা হবে উটের হেলানো কুঁজের মত। এরা জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের খুশবুও পাবে না। অথচ জান্নাতের খুশবু এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১২৮)

এ সকল হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, পোশাক সতর আবৃত করলেও তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে যদি তা দেহ আবৃত করার মূল উদ্দেশ্য পূরণ না করে। এটা আবার দু'টি কারণে হতে পারে। (এক) তা এমন পাতলা যে, চামড়ার রং কাপড়ের বাইরে থেকে বোঝা যায়। (দুই) তা অতি মোলায়েম ও আঁটসাঁট হওয়ার কারণে দেহের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, আবৃত অঙ্গের মূল আকৃতি বাইরে থেকে ফুটে ওঠে। উভয় প্রকার পোশাকই ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম।

৩. পোশাক-পরিচ্ছদে নারী-পুরুষ একে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে পারবে না : বেশ-ভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছদে নারীরা পুরুষদের এবং পুরুষরা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব পুরুষের উপর লা'নত করেছেন যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং সেই সব নারীর উপরও লা'নত করেছেন যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৮৮৫)

আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المرأة والمرأة تلبس لبسه الرجل.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীকে লা'নত করেছেন।

৪. কাফির ও মুশরিকদের পোশাকের সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من تشبه بقوم فهو منهم.

অর্থ : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৩১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন,

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উসফুর (ছোট ধরনের হলুদ বর্ণের ফুলগাছ) দ্বারা রাঙানো দু'টো কাপড় পরতে দেখে বললেন, এগুলো হচ্ছে কাফিরদের পোশাক, তুমি তা পরিধান করো না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৯১)

একবার হযরত উমর রাযি. আজারবাইজানের মুসলমানের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলেন,

اياكم والتنعم وزى اهل الشرك.

অর্থ : তোমরা বিলাসিতা ও মুশরিকদের পোশাক পরা থেকে বেঁচে থাকবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৭০)

৫. অহঙ্কার ও প্রসিদ্ধির পোশাক হতে পারবে না : ইসলামে মানুষের মধ্যে সরলতা, বিনয়, ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী বিকাশে সচেষ্ট। এজন্য অহঙ্কার, অহমিকা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মানবতা বিরোধী গুণাবলীকে কঠিনভাবে নিন্দা করা হয়েছে। পোশাক সর্বক্ষণ মানুষের দেহ আবৃত করে রাখে। পোশাকের মধ্যে অহঙ্কারের প্রকাশ থাকলে তা মানুষের হৃদয়ে অহঙ্কারকে স্থায়ী করে দেয়। এজন্য পোশাকের ক্ষেত্রেও অহঙ্কার বা অহমিকা প্রকাশের জন্য বা প্রসিদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করতে হাদীসে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধির পোশাকের অর্থ, যে পোশাক সমাজের সাধারণ মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অথবা পরিধানকারীকে উক্ত পোশাকের কারণে আশপাশের মানুষদের আলোচনার পাত্র হতে হয়। এই ধরনের প্রসিদ্ধির পোশাক বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। অতি বিনয় প্রকাশক পোশাক, বেশি ছেড়া-তালিযুক্ত পোশাক, বেশি নোংরা পোশাক, অতি মূল্যবান পোশাক, সমাজে অপ্রচলিত কোন ফ্যাশন বা ডিজাইনের পোশাক, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার সাথে অসামঞ্জস্য পোশাক ইত্যাদি যে কোন 'প্রসিদ্ধি দানকারী' পোশাক পরিধান হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله (ثوب مذلة) ثم تلهب فيه النار.

অর্থ : যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির (দৃষ্টি আকর্ষণকারী) পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবেন এবং তাতে (জাহান্নামের) অগ্নি সংযোগ করবেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০২৯, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৬২৪৫)

তিনি আরো বলেন,

من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه.

অর্থ : যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন এবং তাকে যখন চান অপমানিত করবেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৬০৮)

একটি যঈফ সনদে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: المشهورة فى حسنها والمشهورة فى قبحها.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ধরনের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। (এক) উৎকৃষ্ট হওয়ার মধ্যে প্রসিদ্ধ, (দুই) নিকৃষ্ট হওয়ার মধ্যে প্রসিদ্ধ।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইসলামে যেমন প্রসিদ্ধি ও অহঙ্কারের পোশাক নিষেধ করা হয়েছে তেমনি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

৬. নারীদের পোশাক পদযুগল আবৃত করবে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে টাখনুর উপরে আর নারীদেরকে টাখনু আবৃত করে পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الذيل ما قال قالت أم سلمة كيف بنا؟ قال تجرون شبرا قالت إذا تنكشف القدمان قال تجرون ذراعا.

অর্থ : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড়ের ঝুল সম্পর্কে (টাখনুর উপরে বা নিসফ সাক পর্যন্ত রাখা সম্পর্কে) কথা বললেন, তখন উম্মে সালামা বলেন, নারীদের পোশাকের কী হবে? তিনি বললেন, তোমরা (পুরুষদের ঝুল থেকে নিসফ সাক থেকে বা টাখনু থেকে) এক বিঘত বেশি ঝুলিয়ে রাখবে। তিনি বললেন, তাহলে তো হাঁটার সময় পদযুগল অনাবৃত হয়ে যাবে। তিনি বললেন, তাহলে এক হাত বেশি ঝুলাবে। (তাবারানী : মু'জামুল কাবীর; হা.নং ১০০৮)

অর্থাৎ নিসফ সাক বা টাখনু থেকে এক বিঘত ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করলে চলাচল বা কাজের সময় বা সালাতের মধ্যে সেজদার সময় পায়ের পাতা অনাবৃত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাত ঝুলিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন। মূল উদ্দেশ্য পায়ের নলা ও পায়ের পাতার উপরিভাগসহ পুরো পা আবৃত রাখা।

৭. পোশাক কোন ছবি বা ধর্মের প্রতীক সম্বলিত হতে পারবে না : ইসলামে সকল প্রকার শিরকের মূলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে শিরকের উৎসগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিরক প্রসারের অন্যতম মাধ্যম ছবি। এজন্য বিশেষভাবে দু' প্রকারের ছবি ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। (এক) কোন প্রাণীর ছবি, (দুই) কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পূজিত বা সম্মানিত কোন দ্রব্য বা স্থানের ছবি যদিও তা জড় বা প্রাণহীন হয়।

এ সকল প্রাণী বা বস্তুর ছবি অঙ্কন করা, ব্যবহার করা, টানানো বা পোশাকে বহন করা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। এ সকল কর্মে জড়িতদের জন্য পরলৌকিক জীবনে কঠিনতম শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উপরন্তু এগুলো দেখলে তা মুছে ফেলতে বা ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযি. এর পুলিশ বাহিনীর প্রধান আবুল হাইয়ায আসদী বলেন,

قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته... ولا صورة الا طمستها.

অর্থ : আলী রাযি. আমাকে বলেন, আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন, যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে। (কবরের পরিচিতি জ্ঞাপক স্বাভাবিক উচ্চতার বেশি) কোন উঁচু কবর দেখলে তা সমান করে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯৬৯)

এখানে ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই ছবি কাপড় বা পোশাকে আঁকলেও তা মুছে ফেলতে হবে বা কেটে ফেলতে হবে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب (تصاوير) إلا نقضه (قضبه) (وللاسماعيلى سترا اوثوبا).

অর্থ : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়িতে ছবি, ক্রুস বা ক্রুসের ছবি সম্বলিত কোন কিছু, কাপড় হোক, পর্দা হোক, যাই হোক না কেন, তা রাখতে দিতেন না। তা খুলে ফেলতেন বা (ছবির অংশটুকু) কেটে ফেলতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫২)

৮. অপচয় ও অপব্যয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে : অপচয় সর্ব ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا مالم يخالطه إسراف أومخيلة.

অর্থ : তোমরা খাও, পান কর, অন্যদের দান কর এবং পোশাক পরিধান কর যে পর্যন্ত অপচয় ও অহঙ্কার না হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৬০৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন অপচয় ও অপব্যয় নিষেধ করেছেন তেমনি সম্পদ থাকতে কার্পণ্য করতেও নিষেধ করেছেন। হযরত আবুল আহওয়াস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال؟ قال نعم ......

অর্থ : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তখন আমার পরণে ছিল অতি নিম্নমানের পোশাক। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সম্পদ আছে? বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কী সম্পদ আছে? বললাম, সব ধরনের সম্পদই আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গোলাম ইত্যাদি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তখন তোমার উপর তাঁর নেয়ামতের ছাপ থাকা চাই। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৫৭)

৯. পোশাক পরিষ্কার ও পরিপাটি হওয়া কাম্য : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন তাঁর উম্মতকে পোশাকের ক্ষেত্রে অহঙ্কার ও প্রসিদ্ধি লাভের বাসনা বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, পাশাপাশি তিনি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। সবকিছুর সাথে তিনি সরলতা ও বিনয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে শিখিয়েছেন। তিনি বাড়ি-ঘর, যানবাহন ও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পোশাকের ক্ষেত্রেও অহঙ্কারমুক্ত সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। তিনি নিজে সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকতেন, কাউকে অপরিচ্ছন্ন ও অগোছালো দেখলে আপত্তি করতেন এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر فقال رجل يا رسول الله إني ليعجبني أن يكون ثوبي جديدا (غسيلا) ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه قال ذاك الجمال إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه (بطر) الحق وازدرى الناس.

অর্থ : যার অন্তরে এক দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুবই ভালো লাগে যে, আমার পোশাক সুন্দর হোক, আমার মাথার চুল পরিপাটি করে তেল দিয়ে আঁচড়ানো থাকুক, আমার জুতার ফিতা নতুন হোক। এভাবে সে পোশাক-পরিচ্ছদ জাতীয় অনেক বিষয়ের কথা বললো। এমনকি তার ছড়ির আংটার কথাও বললো (যে, সে পছন্দ করে এগুলো সুন্দর হোক)। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো তো সৌন্দর্য। আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। আর অহঙ্কার তো হল, সত্যবিমুখ হওয়া এবং অন্যকে হেয় মনে করা। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯১, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৩৭৮৯)

এ সকল হাদীসে ও এই মর্মে বর্ণিত আরো অনেক সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হল, লৌকিকতা ও অবহেলাজনিত অপরিপাট্য ও এলোমেলো ভাব পরিত্যাগ করে পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, সুন্দর ও সামর্থ্য আনুপাতিক মূল্যমানের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা।

লেখক: শিক্ষার্থী, ইফতা ৪র্থ বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

তালিবুল ইলমের সুস্থ রুচিবোধ

মূল: মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ.

অনুবাদ: মাওলানা মাহমূদ

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা সিলেবাসে এ অপূর্ণতা রয়েছে যে, তার দ্বারা (বৈষয়িক) অনেক প্রয়োজন পূরণ সম্ভব হয় না। দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন বাস্তবপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রই এ কথার সমর্থন করবেন। আর আমাদের শিক্ষা সিলেবাসও (বৈষয়িক) যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে পূর্ণতার দাবী করে না। সিলেবাস তো মূলত একটি বিশেষ যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যম, যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিশারী হয় এবং নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালনে আলাকবর্তিকার ভূমিকা রাখে।

এ সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর মাঝে এতটুকু যোগ্যতা সৃষ্টি করে যে, সে কিতাব দ্বারা উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। মানব জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের প্রতিশ্রুতি সে প্রদান করে না। অর্থাৎ, যদিও আমাদের সিলেবাসে যোগ্যতা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তথাপি তা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের নেতৃত্ব প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। আজ এটি একটি বড় প্রশ্ন যে, আমাদের এ সিলেবাসে বাইরের এমন কোন্ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে যা জীবন এবং পদমর্যাদার প্রয়োজনসমূহকে পূরণ করতে সহায়ক হবে? আর যে পরিবেশে এ সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয় সে পরিবেশের সাথে সঠিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞানীজনই আজ এ প্রশ্নের সম্মুখীন।

যওক (সুস্থ রুচিবোধ) কিভাবে সৃষ্টি করবে?

ইলমী রুচিবোধ তৈরির একটি পন্থা হল, শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার ব্যবস্থাপনা এবং কিতাব অধ্যয়নের ব্যাপারে আসাতিযায়ে কেরাম কর্তৃক সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনা। যাতে শিক্ষার্থী জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে পিছিয়ে না পড়ে। যখন সে একটি কিতাব অধ্যয়ন সম্পন্ন করবে এবং সম্পূর্ণরূপে তা আত্মস্থ করবে তখন যাতে আপন জীবন সম্পর্কে অপরিচিতের ভাব তাকে পশ্চাৎপদ না করে দেয়।

দ্বিতীয় একটি পন্থা হল, শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে ইলমী মজলিসের আয়োজন করা। যা তালিবে ইলমের সামনে ইলমের নিত্য-নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের দিগন্ত উন্মোচিত করবে। ইলমী রুচিবোধ সৃষ্টির এ কার্যকরী পন্থাটি আমাদের দেশে ফলপ্রসু প্রমাণিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ইসলামী ইউনিভার্সিটি যেমন আলীগড়, জামিয়া মিল্লিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ইলমী মারকাযেও এ ধারার সমাদর রয়েছে।

বাস্তবতার নিরিখেও এ বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। কেননা এর দ্বারা শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক নিজ বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে 'ইলম'-এর নির্যাস বিতরণের সুযোগ তৈরি হয়। এ জন্য তালিবে ইলম ভাইদের উচিত, আহলে ইলমের মজলিসে গুরুত্বের সাথে অংশগ্রহণ করা। কেননা ইলমী ও শাস্ত্রীয় রুচি তখনই তৈরি হয় যখন আহলে ইলমের মজলিসের সাথে সম্পর্ক রাখা হয়। এ সকল মজলিসে অংশগ্রহণের উপকারিতা এতটাই ব্যাপক যে, তালিবে ইলম খুব সামান্য তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমেই কর্মের ময়দানে এগিয়ে যেতে পারে। আমার এ কথাগুলোর সঠিক উপলব্ধি ঐ তালিবে ইলমের পক্ষে সম্ভব, যে কি না আল্লামা শিবলী নোমানী এবং সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর মজলিসে নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইলমের ঝর্ণাধারায় সিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। যে সৌভাগ্য তার মাঝে কাঙ্ক্ষিত অনুভূতি, যওক এবং যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে; যে সৌভাগ্যের ছোঁয়া সবাই পায় না। আমি নিজেও আহলে ইলমের এমন অনেক মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থেই ইলমী মজলিস ছিল। তার মধ্যে সাইয়েদ সুলায়মান নদবী, শাহ হালীম আতা ছাহেব এবং আল্লামা ইকবালের মজলিসগুলো অন্যতম। যদিও আল্লামা ইকবালের মজলিসে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য জীবনে দু'বারই অর্জিত হয়েছে।

এ বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের কারণ যে, 'আহলে কামাল' তথা বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এখানে (দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে) আগমন করবেন এবং হৃদয় নিংড়ানো ইলমের নির্যাসে তালিবে ইলমদের সিক্ত করবেন। তা সত্ত্বেও যদি তালিবে ইলম ভাইদের ইলমী জীবনে কোন পরিবর্তন না আসে তবে তা বড়ই হতাশা ও দুর্ভাগ্যের কথা।

যদি এখানে (ইলমী মারকাযে) ইতিহাস ও ইসলামী কোন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আগমন ঘটে তবে আমার মতে বৈষয়িক জ্ঞানের অধিকারী বিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকেও আহবান জানানো উচিত যারা পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিবেন। অনুরূপভাবে সাহিত্যানুরাগ সৃষ্টির জন্য কবি-সাহিত্যিকদেরও আমন্ত্রণ জানানো উচিত।

এ যামানা হল 'বিশেষজ্ঞ' হওয়ার যামানা। সুতরাং তালিবে ইলম ভাইদের জ্ঞানের পরিধি এতটাই বিস্তৃত হওয়া উচিত, যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে বরং সেখানকার প্রফেসরদের উপস্থিতিতে নিঃশঙ্কচিত্তে কথা বলতে পারে এবং তাদের সহাবস্থানে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ইতস্তত ও সংকোচ অনুভব না করে।

এমনিভাবে দীনী যওক ও রুচিবোধও আহলুল্লাহদের মজলিসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ইলমী রুচিবোধ কথাটি ভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় (বরং তা কেবল অনুভবের)। আল্লাহ তা'আলা যাকে তা দান করেন কেবল সেই তা অনুধাবন করতে পারে। প্রত্যেক বিষয়ের রুচিবোধ অর্জনের অভিন্ন পন্থা হল, উক্ত বিষয়ের রুচিবান ব্যক্তিবর্গের সাহচার্য গ্রহণ করা।

ইলমী রুচিবোধ তৈরির গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। আজ মানুষ তার জীবনের কাঙ্ক্ষিত রুচিবোধ হারিয়ে ফেলেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন যাপনের অভিরুচিও আজ অনুপস্থিত। জাগতিক উন্নতির শীর্ষচূড়ায় আরোহন করেও পাশ্চাত্য আজ মানব জীবনে সুস্থ রুচিবোধ থেকে বঞ্চিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আকাশ ছোঁয়া উৎকর্ষ সত্ত্বেও তাদের জীবনে মানবসান্নিধ্যের অপরিহার্যতা এখনো অনস্বীকার্য...।

(১০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

জুব্বাটি প্রাণপ্রিয় মদীনার

আমি যাকে ভালোবাসি তার ভেতরটা পরম আলোকিত; মক্কা-মদীনার প্রেমে দারুণ উদ্ভাসিত। প্রেমের সে আকর্ষণে তিনি প্রতি বছরই ছুটে যান কা'বার যিয়ারতে, রওযা পাকের একান্ত সান্নিধ্যে। এবারও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। যা ঘটেছে তা হল, ফেরার পথে মদীনার বাজার থেকে তিনি আমার জন্য একটি জুব্বা এনেছেন। জুব্বাটি পেয়ে আমার হৃদয়ে এক অব্যক্ত ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছে। জুব্বাটির শুভ্রতা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে দারুণভাবে। প্রাণপ্রিয় মদীনার এ তোহফায় আমি বিমুগ্ধ বিমোহিত। এতে আমি অনুভব করেছি লিবাসুল ইহরামের আলো এবং পেয়েছি মদীনাওয়ালার সুরভি। জুব্বাটি যখন গায়ে জড়াই, হৃদয় আমার কেমন উতলা হয়ে ওঠে। যিয়ারাতে মদীনার স্বপ্নে যেন দোল খেতে থাকি। অজান্তেই মন আমার কবি হয়ে ওঠে– দেখার আশায় আশায়, চোখের জলে বহে নদী;/ স্বপ্নে হলেও তাকে একবার দেখতাম যদি...'

হে কাবা ঘরের প্রভু! নসীব করো আমায় তোমার ঘরের দীদার। হাজী সাহেবকে দান করো উত্তম বিনিময়। আর পরকালে তাকে দান করো জান্নাতের সবুজ পোশাক। কারণ তিনিই তো আমার মধুময় এই চেতনার বাতিঘর।

ইয়া আল্লাহ! মদীনার জুব্বা পরিয়েছ; ইহরামের কাপড় না পরিয়ে মৃত্যু দিও না! বুকভরা স্বপ্ন দিয়েছ; স্বপ্ন তুমি অপূর্ণ রেখো না! তৃষ্ণা দিয়েছ তোমার ঘরের, প্রেম দিয়েছ তোমার নবীর; হে প্রভু! তৃষ্ণা নিবারণ না করিয়ে, নবীর চরণে প্রেম নিবেদন না করিয়ে– নিও না, নিও না, নিও না আমায়!

আসাদুল্লাহ মাহমুদ
জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ।

যার পরশে ধন্য আমি

জনম দুঃখিনী অসহায় মাতৃজাতির মুখে হাসি ফোটাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের কোলে সন্তান দান করেন। সন্তানের মুখপানে চেয়ে মায়েরা ভুলে যান জীবনের সকল দুঃখগাথা। আমিও আমার মায়ের চোখের তারা, আদরের দুলাল। পৃথিবীর আলো বাতাসে চোখ মেলার পূর্বে মা আমাকে নিয়ে চলাফেরায় কত কষ্ট করেছেন। না পেরেছেন পেট পুরে আহার করতে, আর না মনের আনন্দে কাজ করতে। এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছেন কত নির্ঘুম রাত। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও 'মা' আমাকে নিয়ে বহু কষ্ট করেছেন। আমার সকল ব্যথা-বেদনা, অন্যায়-অত্যাচার অম্লান বদনে সহ্য করেছেন। আমার অপরিমেয় দুঃখ-যাতনা ফুলের মত বরণ করেছেন। তার মায়াময় আঁচলতলে, সীমাহীন আদর-যত্নে আজ সমাজে মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছি। বিবাহ-শাদী করেছি, এবং আমিও হয়েছি সন্তানের পিতা। পিতৃত্বের সুবাদে আজ আমি মায়ের ভালোবাসা মর্মে মর্মে অনুভব করি। হে আমার আল্লাহ! আপনি আমার মায়ের প্রতি দয়া ও করুণা বর্ষণ করুন যেমন তিনি শৈশবে আমার প্রতি দয়া-মায়ার আচরণ করেছেন।

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
মোমেনশাহী।

আমার মা

মা-বাবার ছোট সন্তান হিসেবে আমার প্রতি তাদের আদরটা এমনিতেই একটু বেশি। তার উপর বাল্যকালেই বাবার মৃত্যুতে মায়ের স্নেহটা আরো বেড়ে যায়। বাবার অভাবটাও তিনি পূরণ করতে থাকেন। কখনো শাসন কখনো স্নেহ। আমার ছোট ছোট দুষ্টুমীগুলো মাকে খুব আনন্দ দিত। ছোট ছোট অলসতাগুলোও মা বেশ উপভোগ করেন। খাবার খেতে বিলম্ব করা, তারপর মায়ের বকুনি খেয়ে খেতে আসা। মশারী না টানিয়ে শুয়ে পড়া, তারপর গভীর রজনীতে মায়ের বকুনি, অতঃপর পরিচিত সেই বাক্যটি 'তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না', তারপর মা নিজেই মশারী টানিয়ে দেয়ার ব্যাপারগুলো ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। মনে হয় এসব বিষয়ও মায়ের খুব ভালো লাগত। মায়ের এ ধরনের বকুনিও আমার দারুণ লাগত। হঠাৎ আমার মাঝে ভালোমানুষী চেপে বসল। আগের সব অলসতা, চপলতা ছেড়ে ভালো মানুষ বনে গেলাম। ডাকার পূর্বেই সময়মত খেতে আসা, নিজের কাপড় নিজেই পরিষ্কার করা সব করতে লাগলাম। কিন্তু একি? যার এতে আনন্দিত হওয়ার কথা সেই দেখি নারায। মায়ের চেহারায় খুশির পরিবর্তে বিষণ্নতার ছাপ। এক রাতে মা শিয়রে বসে বললেন, বাবা! তোর হয়েছেটা কী?

আমি শুধু হাসি আর মনে মনে ভাবি, মায়েরা বুঝি এমনই হন! সন্তানের প্রতি তাদের ভালোবাসাটা আসলেই অন্তহীন।

পুনশ্চঃ ইদানিং আমার মা বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত। মনের অজান্তেই চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে ওঠে যখন কল্পনা করি, একদিন বাবার মতো মা-ও আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন। জানি না, কি করে মেনে নেব সে মুহূর্তটাকে। আল্লাহ আমার মাকে হায়াতে তায়্যিবা দান করুন। আ-মীন।

আবু আব্দুল্লাহ
শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

বিজয়ের লাল সূর্য

২৫ মার্চ। সূর্যাস্তের রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়েছে শহরজুড়ে। প্রাচীন বাড়ির জানালার শার্সিগুলো জ্বলছে ক্রুদ্ধ দীপ্তিতে। যেন প্রতিটি ক্ষতমুখ থেকে ঝরে পড়ছে রক্তিম জীবনরস। ধীরে ধীরে পুরো শহর মৃত্যুপুরির নিকষ আধারে ঢেকে গেল। মধ্যরাতে নগর-প্রাচীরের গাঢ় অন্ধকারে জ্বলে উঠল অগণন লেলিহান শিখা। ট্যাংক-কামানের গোলায় কেঁপে উঠলো সারাটা শহর। বাংলার মানুষ ৭১-এর নয়টা মাস কাটালো গোলা বারুদের গন্ধে।

সেই দিনগুলোতে নারীদের করুণ আর্তনাদ, শিশুদের অসহায় চিৎকার ভেসে আসত শহর-গ্রামের দালান-কোটা থেকে। পুরুষরা বেঁচে থাকত মৃত্যুর ছায়া ধারণ করে অতি সঙ্গোপনে।

আসলে পাকিস্তানী হানাদাররা বীরত্ব খুঁজে পেয়েছিল মানুষের প্রাণ হরণের মধ্যে। তাই দেদারসে মানুষ হত্যা করেছে তারা। তারা জানত না, প্রকৃত বীরত্ব হল, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করায়; জীবন নাশ করায় নয়। তাদের এই দুঃকর্মের কারণে শবদেহের স্তূপে চেপে থাকা অগ্নির বিস্ফোরণ ঘটল। সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল এই আগুন। এভাবে একদিন বাংলাদেশীদের ভাগ্যে পরিবর্তন এলো। সবুজ বাংলায় উদিত হল বিজয়ের লাল সূর্য; ১৬ ডিসেম্বর।

হাসান আব্দুল্লাহ
কাপাসিয়া, গাজিপুর।

মুহাদ্দিস ছাহেব রহ.

বাইরে তখন প্রচুর কুয়াশা নেমেছে। মাদরাসার বালুকা চত্বরে ভারি বস্ত্র ফুঁড়ে শীত সমগ্র দেহে সুচ ফোটাচ্ছিল। এর মধ্যে বিপুল উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছে আমার সহপাঠিরা। প্রতিদিনের মত লেপ মুড়ি দিয়ে শোয়া হল না আজ। সবার সাথে আমিও কাজে শরীক হলাম। আজ জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ায় দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরামের আগমন ঘটবে।

সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হল অনুষ্ঠান। শুরু হল, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (মুহাদ্দিস ছাহেব) রহ.-এর জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা। এ মহান মনীষীর জীবন ও কর্ম তুলে ধরে বর্তমান সময়ের শীর্ষ আলেমগণ আলোচনা রাখলেন। আমার ছোট্ট ভাবনায় মুহাদ্দিস ছাহেব রহ.কে যত বড় কল্পনা করতাম, সভা শেষে তার চেয়ে অনেক বড় মনে হয়েছে তাকে।

তিনি মুহাদ্দিস ছাহেব নামে প্রসিদ্ধ হলেও সব বিষয়ে ছিল তাঁর স্বীকৃত পাণ্ডিত্য। জ্ঞানে-গুণে সমকালীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। চাইলে অহমিকায় তার পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু বিনয় তার - স্বভাব-সত্তায় মিশে গিয়েছিল। জ্ঞানের অভিমান তার কোনদিনই ছিল না। চলাফেরায় ছিল না অলঙ্করণ। জনারণ্যের মধ্যেও তিনি একা থাকতেন। সবার সাথে মিলতেন বটে; কিন্তু সবার চেতনায় মিশে যেতেন না। চলতেন সুনির্দিষ্ট এক আলোক রেখার নিশানা ধরে।

আবূ নুআইম
শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

স্পেনের কারগুজারী

ফজরের নামাযের পর এ'লান হল, আজ বাদ আসর মসজিদে কারগুজারী শোনানো হবে। এক বড়ভাইকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম, আমাদের মাদরাসার প্রবীণ উস্তাদ হযরত মাওলানা আবূ বকর ছাহেব তিন চিল্লার জন্য স্পেন সফরে গিয়েছিলেন, আজ বিকেলে সেই সফরের কারগুজারী শোনানো হবে। শুনে খুব আনন্দিত হলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন আসর হয়। সময় গড়িয়ে একসময় আসর হল। নামাযের পর হুযূর বয়ান শুরু করলেন।

হুযূর প্রথমে শোনালেন স্পেনে যাওয়ার আগের কথা, ভিসার জন্য কত দৌড়ঝাঁপ করেছেন সে কষ্টের কথা। টানা তিন মাস সময় লেগেছে ভিসা পেতে। এরপর শোনালেন যাওয়ার পরের কাহিনী। শুনে মুগ্ধ হলাম, আবার দুঃখও পেলাম। আজ ইসলামের ভালো ভালো গুণগুলো খ্রিস্টানরা গ্রহণ করেছে। যেখানে পরোপকারের গুণটি মুসলমানদের মধ্যে সবচে' বেশি থাকার কথা ছিল, সেখানে তারা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। এমনকি এক ভাই আরেক ভাইয়ের ক্ষতি পর্যন্ত করছে; মারামারি, খুন-খারাবীতে লিপ্ত হচ্ছে। খ্রিস্টানরা এ সুযোগে মুসলমানদেরকে শেষ করে দিচ্ছে। হুযূর বললেন, সমস্ত ইউরোপে একটাও নিয়মিত মসজিদ নেই; আমাদেরকে থাকতে হয়েছে ঘর ভাড়া করে। এককথায় যে মুসলিমস্পেন একসময় সারা দুনিয়ার দীনের পিপাসা মিটিয়েছে সেখানে আজ মুসলমানদের বড়ই দুর্দিন। হুযূর আমাদেরকে ভালোভাবে পড়াশোনা করে বড় আলেম হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার প্রতিজ্ঞা করালেন। আমিও ইচ্ছা করলাম বড় হয়ে স্পেন সফরে যাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। আমীন।

সাআদ বিন আসআদ
শিক্ষার্থ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

নাহবেমীর থেকে তাইসীর

আমি জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করছি। আমার খুব প্রিয় মাদরাসা এটি। এ মাদরাসার উস্তাদরাও আমার খুব প্রিয়। তবে এখানে যখন প্রথম ভর্তি হই তখন আমার মোটেও ভালো লাগছিল না। প্রথম প্রথম কি আর কারো ভালো লাগে? তাতে আবার শুরুতেই ভুল করে বসলাম। ঘটনা হল, আমি ভর্তি হয়েছি তাইসীর জামাআতে। প্রথম দিন দরসে হাজির হয়েছি। হুযূর এসে হাযিরা ডাকা শুরু করলেন। আমি অপেক্ষায় আছি কখন আমার নাম ডাকা হবে। কিন্তু না, আমার নাম ডাকা হল না। ভেবে পাচ্ছি না– কী হল, আমার নাম কেন ডাকা হল না। এক সহপাঠিকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, এটা নাহবেমীর জামাআত। শুনে তো আমি লজ্জায় মরি মরি! পরে খুঁজে খুঁজে তাইসীর জামাআত বের করলাম। এসে দেখি হাযিরা ডাকা শেষ। হুযূরকে বললাম, আমার নাম আহমাদ উসামা, আমার নাম কি ডাকা হয়েছে? হুযূর আমাকে দেখে চিনে ফেললেন এবং পাশের হুযূরকে বললেন, হুযূর! এ আমাদের আহসানুল্লাহ ভাইয়ের ছেলে।

আমাকে চিনতে পারার কারণ হল, আমার আব্বাজান ছিলেন হুযূরের সহপাঠি। সে সময় তো হুযূরদেরকে ঠিকমত চিনতাম না। পরবর্তীতে জানতে পারি যে, ইনি হযরত মাওলানা মীযানুর রহমান ভৈরবী ছাহেব দা.বা.।

এরপর সম্মুখীন হলাম আরেক সমস্যার। হযরত ভৈরবী ছাহেব হুযূর আমার থাকার জায়গা ঠিক করে দেন। মাথা উপরে কোন ফ্যান নেই। নিচে প্লাস্টারও করা হয়নি। তাতে আবার কিছু বিছানোও নেই। পাশে তাকিয়ে দেখলাম জানালায় গ্লাসও লাগানো হয়নি। সেদিন রাতে কী যে কষ্ট হয়েছিল, মশার কামড়ে কেউ ঘুমুতে পারিনি। পরের দিন অবশ্য মশারী কিনেছি। সেদিন যে কী আরামে ঘুমিয়েছি তা আগের দিন কষ্ট না করলে বুঝতেই পারতাম না।

কিছুদিন পর মাদরাসায় তরবিয়াতী জলসা অনুষ্ঠিত হল। সেদিন বড় বড় হুযূরদের নসীহত শুনে মনটা ভালো হয়ে গেল।

আহমাদ উসামা
শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

বন্ধু তুমি ফিরে এসো তোমারই পথে

হঠাৎ আজ এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মূলত এ বন্ধুটিই আমার হাফেয হওয়ার উসিলা হয়েছিলো। তার বয়স তখন আট কি নয়। তিন পারা কুরআন হিফয করেছে। একদিন মকতবে পড়তে এসে তার মুখে মুখস্থ তিলাওয়াত শুনে মনটা আনন্দে ভরে গেল। যারপরনাই বিস্মিত হলাম, এত ছোট ছেলে কিভাবে কুরআন মুখস্থ করলো। সাথে সাথে নিয়ত করে ফেললাম, যেভাবেই হোক আমাকেও তার মতো কুরআন তিলাওয়াত শিখতে হবে এবং কুরআনের হাফেয হতে হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিয়তকে কবুল করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই হাফেয হয়ে গেলাম। আল্লাহর তাওফীকে এখন ইফতায় তাখাসসুস করছি। কিন্তু আমার সেই বন্ধুটি এখন আর এ পথে নেই; সে এখন ভিন্ন পথের যাত্রী। পাল্টে গেছে তার জীবন যাত্রা। দেখলে মনেই হয় না একদিন সে কুরআনের হাফেয ছিল। যে আমার দীনের পথে আসার জন্য মাধ্যম হলো সে-ই এখন সোজা পথে নেই। আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমার বন্ধুটিকে সুপথে ফিরিয়ে আনেন এবং কুরআনের মর্যাদা রক্ষা করার তাওফীক দান করেন।

আর আমাদেরকেও তাঁর পথে স্থির অবিচল রাখেন। কোন অপরাধের কারণে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে না দেন। বস্তুত তিনিই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

ইবরাহীম
মানিকগঞ্জ।